সন্তোষ ঢালী

৭১

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প

সন্তোষ ঢালী

গ্রন্থ কুটির

সন্তোষ ঢালী
মা: শ্রীমতীদেবী ঢালী
বাবা: নিত্যানন্দ ঢালী
জন্ম: পয়লা বসন্ত ১৩৭০, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪।
জন্মস্থান: পুকুরিয়া, কদমবাড়ি, রাজৈর, মাদারীপুর।
শিক্ষা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে
বি.এ.(অনার্স), এম.এ, বি.এড, এম.ফিল, পিএইচ.ডি।
সংগীত: বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে
উচ্চাঙ্গ সংগীতে সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ।
শখ: গিটার বাজানো, গান করা, আবৃত্তি করা।
তালিকাভুক্ত শিল্পী: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা ও
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
তালিকাভুক্ত গীতিকার: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
পেশা: অধ্যাপনা। বি.সি.এস.(শিক্ষা)।
কর্মস্থল: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ;
সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর।
পুরস্কার: একুশের সাহিত্য পুরস্কার, মুক্তধারা ১৯৯০,
সুনীল সাহিত্য পুরস্কার, মাদারীপুর ২০০৯,
অনুভব সম্মাননা, ঢাকা ২০১৩,
বিন্দু বিসর্গ সম্মাননা, গাইবান্ধা ২০১৬।
প্রকাশিত বই:
কবিতা: ফসিল, প্রপার জন্য পঙ্‌ক্তিমালা,
একলব্যের তীর, ভুবনডাঙা, আকাল।
গল্প: অন্তরঙ্গ দ্বৈরথে, নিলামবালা, ছাই, দর্পণ, ৭১।
উপন্যাস: মন না মতি, অচেনা মানুষ।
পাঠ্য: ব্যাবহারিক বাংলা (ব্যাকরণ)।
অভিপ্রায়: ফিরে চল মাটির টানে।

৭১ সম্পর্কে

৭১ সন্তোষ ঢালীর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ। এতে স্থান পেয়েছে এগারটি ছোটগল্প। এ গ্রন্থটির বিশেষত্ব– এর সবগুলো গল্পই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক। বাংলাদেশের, বাঙালির জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। বড় অর্জন স্বাধীনতা। বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু সে জন্য বড় বেশি মূল্য দিতে হয়েছে বাঙালিকে। পৃথিবী শীতল হলেও তার অভ্যন্তরে এখনও যেমন ফুটছে জ্বলন্ত লাভা, বাঙালির হৃদয়েও তেমনি প্রজ্বলন্ত রয়েছে দগদগে আগুন; যা কখনওই নেভবার নয়। মর্মন্তুদ এবং হৃদয়বিদারক। মানুষের সে দুর্দশা ও অসহায়ত্বের করুণ চিত্র রয়েছে প্রত্যেক গল্পে। তারই লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে প্রতিটা গল্পে। গল্পের শেষে অপেক্ষা করে থাকে এক রুদ্ধশ্বাসকর মুহূর্ত; আর আত্মার ক্ষমাহীন আর্তনাদ।

গল্পের আসরে সন্তোষ ঢালী নতুন নন। সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় একজন ছোটগল্পকার তিনি। ইতোমধ্যে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন নিজস্ব ভাষারীতি, যা সহজেই তাঁকে শণাক্ত করে। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে আলাদা একটা ঢং। ছোট ছোট মনোমুগ্ধকর বাক্যে ঠিক যেন ঠুমরির গিট্‌কারির মতো ছুঁড়ে দেন শব্দমালা। বর্ণনা কাব্যময়। গল্পের মধ্যে নাটকীয়তা পাঠককে আকৃষ্ট করে। নিয়ে যায় কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে। আর চরিত্র-নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো জীবন্ত। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্পগুলো একত্র করে এ সঙ্কলন। মুক্তিকামী মানুষের কাছে গ্রন্থটির আবেদন অনস্বীকার্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ হতে গ্রন্থটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আশা করি বইটি পাঠকের সমাদর পাবে। জয়তু **৭১**।

– প্রকাশক

৭১
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প
সন্তোষ ঢালী

প্রকাশকাল	:	বইমেলা, ২০১৭
প্রকাশক	:	রতন চন্দ্র পাল গ্রন্থ কুটির ২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
গ্রন্থস্বত্ব	:	সংহিতা ঢালী খেয়া
প্রচ্ছদ	:	ধ্রুব এষ
বর্ণবিন্যাস	:	সুপ্তি কম্পিউটার সিস্টেম এন্ড গ্রাফিক্স
মুদ্রণ	:	দিকদর্শন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
পরিবেশক	:	দিকদর্শন প্রকাশনী লি. ২৬ বাংলাবাজার, আলীরেজা মার্কেট (২য় তলা), ঢাকা ১১০০ ফোন : ৭১১৫৬১৮, ০১৭১২-১১৯৩১৮।
মূল্য	:	২০০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN: 978-9849281757

সূচি

৭১	০৮
খাটাশ	১২
লতিফ চাচা	২১
মিনার	২৬
রক্তের দাগ আজও যায় নি	৩২
নিলামবালা	৩৫
প্রহর	৪৪
রাজাকার	৪৭
রক্তপথিক	৫৩
লাশের নদী	৫৭
আধুলি	৬২

অধ্যাপক মোয়াজ্জম হোসেন মোল্লাহ্
অধ্যাপক নেহাল আহমেদ

সুহৃদ সুজন

৭১

'এ গ্রামের নাম আগে এ রকম ছিল না। আগে ছিল চালতাবাড়ি। এখন নাম হয়েছে পোড়াগাঁও। বুড়োবুড়িরা বলত এ গ্রামে এক সময় প্রচুর চালতাগাছ ছিল। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন ফুল ধরত তখন গোটা গ্রামটাই যেন ফেনিয়ে উঠত। মনে হত সবুজ আকাশে সাদা সাদা মেঘ। চালতার সাদা ফুলের পাপড়িগুলো এতই পাতলা যে মনে হয় সামান্য বাতাসেই ছিঁড়ে যাবে কিংবা ছুঁলেই খসে যাবে। আর পাপড়ি খসে যখন সবুজ সবুজ ফল ধরত তখন কী যে ভালো লাগত। গাছের দিকে তাকালেই জিভে জল এসে যেত। চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ। বনময় এক সবুজ গ্রাম। সেই গাছগুলোর বেশিরভাগই হলো চালতাগাছ। তাই বুঝি গ্রামের নাম চালতাবাড়ি। গাবগাছও ছিল বেশ। তবে চালতাগাছের মতো অত নয়। সে এখন স্মৃতি। এ গ্রামের নাম এখন পোড়াগাঁও। পোড়াগাঁও নাম হওয়ার ইতিহাস সবার জানা। এখন আবার সবুজে সবুজ এ গ্রাম। তবু নাম তার পোড়াগাঁও'– এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নিলেন অজিতবাবু।

ওই পোড়াগাঁয়ে বিকাশের শ্বশুরবাড়ি। বিয়ের পর দশদিনের দিন যেতে হয় শ্বশুরবাড়ি। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে যাওয়া। বেশ খানিকটা মেঠোপথ পেরিয়ে এক জঙ্গলবাড়ি। পাশ দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট একটা খাল। দু'একজন জাল ফেলে মাছ ধরছে। ভেসে থাকা কচুরিতে আলপনা আঁকা গোলাপি-বেগুনি ফুল ধরেছে। দু'পাশে ধানক্ষেত। সবুজে সবুজ। শান্তির বার্তার মতো দূর থেকে ভেসে আসে শীতল বাতাস। সেই মিষ্টি-মধুর বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিতে নিতে স্ত্রী ঝুমু আর শ্যালিকা কুমুকে নিয়ে এক বিকেলে বিকাশ উপস্থিত হয় অজিতবাবুর বাড়ি। বাড়ি তো নয়, প্রকাণ্ড এক বাগান। বিশাল দিঘি। আম-জাম-কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে এক দোতলা বাড়ি। পুরনো। ইটগুলো যেন পান খাওয়া দাঁত বের করে উপহাস করে। সাড়া পেয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। বয়স আশি কি নব্বই। দীর্ঘদেহী কিন্তু বয়োভারে ন্যুব্জ। হাঁক ছাড়লেন– কে?

– আমি ঝুমু, দাদু। তোমার নাতজামাই এসেছে তোমাকে দেখতে।

– তাই বলো। এসো এসো। কী নাম? কোথায় থাকো? কী করো?

– আমি বিকাশ। ঢাকায় থাকি। চাকরি করি।

সাথে সাথে বৃদ্ধের কৃত্রিম ক্রোধ জাগল। কথা শেষ না হতেই তিনি শুরু করলেন–

– কেউ যেন কারো ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া না শেখায়। আর যদি শেখায়ও, চাকরি করতে যেন না দেয়। কাকের বাসায় কোকিলের ছানা পালন করে কী লাভ? পাখা গজালেই ফুড়ুত।

– কেন দাদু, সমস্যা কী?

– কেন? এই দ্যাখো না আমাকে? পঁয়ত্রিশ বিঘা জমির উপর এই বাড়ি, বিশাল বাগান, বিশাল দিঘি। অথচ মানুষ বলতে আমি একা। আমার তিন ছেলে। সবাই এম.এ. পাস। সবাই বড় চাকরি করে। বউমারাও চাকরি করে। তারা দূরে দূরে থাকে। বছরে এক-আধবার আসে কি আসে না। আর এই ভূতুড়ে বাড়িতে আমি একলা পড়ে থাকি ভূতের মতো। সাথে থাকে ওই বুড়ো নরেশ। সব থাকতেও আমার কিছুই নেই। ছেলেরা বাবাকে কাছে রাখতে চায়। আমি তিন ভাগ হয়ে কার কাছে কয়দিন থাকব? পিতৃত্বও এখন ভাগাভাগি হয়ে যায়! এর চেয়ে আমার এই মাটিই ভালো। মাটিতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। রমেশ শীলের একটা গান আছে না– 'মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই'। এ মাটিতেই যে আমার সব মিশে আছে। এদের ফেলে আমি কোথায় যাই?

– ঠিকই বলেছেন দাদু। লেখাপড়া একটু শিখলেই সবাই শহরে চলে যায় চাকরির খোঁজে। গ্রামে থাকে না।

– মাটির সাথে সম্পর্ক না থাকলে মানুষ বাঁচে? শিক্ষিত নাগরিকদের এই মাটির সাথেই সম্পর্ক নেই। অথচ এই মাটিই সব। শিকড় ছাড়া গাছ বাঁচে না। আমিও সেই শিকড়ের টানেই কোথাও যাই না।

বিকাশের বুঝতে অসুবিধে হয় না বৃদ্ধের ক্ষোভের কারণ। নগর কেমন গিলে খাচ্ছে স্নেহ-মায়া-মমতা; সবুজ। বৃদ্ধের এ অসহায়ত্বের জন্য বিকাশের কষ্ট হচ্ছিল। তার নিজের বাবা-মা'র কথা মনে পড়ে যায়। তাঁরাও তো নিঃসঙ্গ দিন কাটাচ্ছেন গ্রামে। ভাই-বোন সবাই বিচ্ছিন্ন। সবাই একত্র হয়ে এক সাথে মিলতে পারে না অনেকদিন। বাবা-মাকেও কাছে এনে রাখতে পারে না। ইচ্ছে হলেই তো তাদের শেকড় ছিঁড়ে তুলে আনা যায় না। সে বড় কঠিন বন্ধন। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য গ্রামের কথা জিজ্ঞেস করতেই অজিতবাবু দীর্ঘ এক ফিরিস্তি দিলেন গ্রামের নাম সম্পর্কে।

ঘর থেকে একটা গাছপাকা পেঁপে আর গোটা কয়েক গাছপাকা সফেদা এনে ঝুমুর হাতে দিলেন অজিতবাবু। ঝুমু আর কুমু মিলে সেগুলো ধুয়ে-মুছে-কেটে-কুটে পরিবেশন করল সবাইকে। গাছপাকা এ ফলের স্বাদই আলাদা। এর মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। সার নেই, রাসায়নিক পদার্থ নেই। গ্রামের এই সহজ সরল মানুষের মতো সহজাত। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ যায় বিকাশের। চোখে পড়ে সফেদা গাছটা। বেশ বড়। পিংপং বলের মতো ধূসর গোলগোল অজস্র সফেদা ডালগুলোকে নুয়ে দিয়েছে। ভারি চমৎকার দেখায়। গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘ হয়ে ঢেকে ফেলেছে উঠোন। উঠোনে ডাটা শাখ। সবুজ। পাখিদের কিচিরমিচির মুখরিত করে তোলে বাতাস। ম্রিয়মাণ হয়ে আসে দিনের আলো। ম্লান আলোয় কী অপূর্ব লাগছে সবকিছু। কেমন এক প্রশান্ত বিকেল সব কষ্ট ধুয়ে দেয়। বড় বিস্ময় লাগে বিকাশের। ভাবে– তাই বুঝি কবিগুরু লিখেছিলেন 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'। বাতাসের কী এক মিষ্টি বুনোগন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরে। এক স্বর্গীয় শান্তি নেমে আসে পৃথিবীতে।

অনেকগুলো ছেলেমেয়ের হৈচৈ শুনে বিকাশ বাইরে তাকায়। কচিকচি কতগুলো ছেলে-মেয়ে পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দ বুকে নিয়ে উল্লাস করছে। মুখে হাসি। হাতে বই খাতা। পেছনে দিদিমণি স্নিগ্ধতার প্রতীক। অজিতবাবু খেয়াল করলেন বিষয়টা। বললেন–

– করুণা। নরেশের মেয়ে। পাঠশালা চালায়। সকালে আসে। আশেপাশের কতগুলো ছেলেপিলে নিয়ে সারাদিন কাটায়। পড়ালেখা থেকে শুরু করে নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় এসব চলে। মাঝে মধ্যে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। বিকেলে সবার ছুটি হলে যে যার বাড়ি চলে যায়। দুপুরে করুণাই বাচ্চাদের রান্না-বান্না করে খাওয়ায়। ভূতুড়ে বাড়িতে ওরাই যা প্রাণের স্পন্দন। আমারও সময়টা কেটে যায়।

করুণাকে দেখে করুণা না হবার কোনো কারণ নেই। পলকেই বিকাশ করুণাকে পাঠ করে ফেলে আপাদমস্তক। সাদা শাড়িতে আবৃত এক জীবন্ত দেবীমূর্তি যেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। পবিত্র হাসিমাখা মুখ। করুণ ডাঙার মতো সিঁথি। সেখানে লালের কোনো রেখা নেই। হাত শাঁখা-শূন্য। বিকাশের মুখে কথা সরে না কিছুক্ষণ। বিকাশের স্ত্রী ঝুমু বলে–

– জানো, আমিও মাঝে-মধ্যে পড়েছি করুণা পিসির কাছে। পিসি কী যে ভালো। পিসি এত সুন্দর রান্না করে, অথচ নিজে মাছ-মাংস-ডিম কিছুই খায় না। সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগেই আছে, অথচ মুখ ফুটে একটা কথাও বলে না। অনেক দুঃখ পিসির। মনের দুঃখ মনেই পুষে রাখে। কেউ তার তল পায় না।

– করুণাই তো দু'বেলা দু'মুঠো রান্না করে দিয়ে যায় আমাকে। ওর হাতের রান্না যেন অমৃত। কিন্তু মেয়েটাকে দেখলে বড় কষ্ট হয়। একাত্তর আমাদের অনেক ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। বুক জুড়ে দিয়ে গেছে রাশি রাশি বিষাদ। বিয়ের এক মাসের মাথায় জামাইবাবা মুক্তিযুদ্ধে গেল। আর ফিরে এল না। কোনো খবরও পাওয়া গেল না আর। বেঁচে আছে, কি মরে গেছে, কেউ জানে না। কোনো ছেলেপুলেও হয় নি। শ্বশুরটা চামার। করুণাকে পাঠিয়ে দিল বাপের কাছে। সেই থেকে করুণা এখানেই। একটা পাঠশালা খুলে ওকে অনেকগুলো ছেলেপিলের দায়িত্ব দিয়ে দিলাম। কষ্টটা অন্তত ভুলে থাকতে পারে কিছুক্ষণের জন্য হলেও।

সন্ধে হয় হয়। বিকাশ উঠে দাঁড়ায় ফেরার জন্য। পেছনে অজিতবাবু চললেন। সাথে বৃদ্ধ নরেশ। অজিতবাবুকে বিষণ্ন লাগছিল। শ্লথ গতি। পায়ে বাঁধা পাথর। যেন বিশাল এক মহীরুহ ঝড়ে ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় কাল গুনছেন। মনে হচ্ছিল গভীরভাবে কিছু একটা খুঁজছেন তিনি অতীতের কৃষ্ণ-গহ্বরে। হাতড়ে পাচ্ছেন না। বললেন–

– চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

বাড়ির পশ্চিমদিকে যেখানে নিয়ে গেলেন, সেখানে অসংখ্য গাছ-পালার ঘন জঙ্গলের ওপাশে সূর্য ডোবার খেলা। রক্তের মতো গাঢ় লাল। সিঁদুরের মতো করুণ। করুণার সিঁথির সিঁদুরের মতো একটু পরেই মুছে যাবে সবটুকু রঙ। অন্ধকার চেটে নেবে ঘন সবুজ। সেই ঘন সবুজের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল দু'টো গাছ। গাব গাছ। অজিতবাবু জানালেন। ওখানে এসেই আটকে গেল তাঁর পা। কোনো পাতা নেই। প্রাণ নেই। শুধু মরা ডাল। পোড়া। রিক্ততার কঠোর উদাহরণ। কষ্টিপাথরের মতো কালো। যেন কালের সাক্ষী। গাঢ় সবুজের মধ্যে কেমন বেমানান। ভৌতিক মনে হয়। হঠাৎ দেখলে গা ছমছম করে ওঠে। প্রেতপুরীতে বিশাল দু'টো প্রেতের কঙ্কালের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে অনাদি অনন্তকাল ধ'রে। গাছ দু'টো যেন কীসের ইঙ্গিত দেয়।

বিকাশের হঠাৎ মনে হলো গাছ দু'টোর আকৃতির মধ্যে এক ভয়ঙ্কর সত্যতা আছে। ডাল এবং গাছের আকৃতি মিলে বাঁ দিকের গাছটা দেখতে কিছুটা বাংলা 'সাত' এর মতো। আর ডান দিকের গাছটা যেন বাংলা 'এক' এর মতো। সহজে অবশ্য তা বোঝা যায় না। ছোটছোট ডালগুলো বাদ দিয়ে একটু কায়দা করে দেখলে ছবিটা ভেসে ওঠে। বিমূর্ত ছবির মতো একটু চিন্তা করলেই অক্ষর দু'টো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুহূর্তে বিকাশ এক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। বলে উঠল–

– গাছ দু'টো দেখে মনে হয় যেন বিশাল কালো অক্ষরে লেখা '৭১'।

পেছনে ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম আভা তাকে আরও চিত্রময় করে তুলেছে। আরও রহস্যময় করে তুলেছে। এ এক সুনিপুণ কারুকাজ। মনে হয় বিশ্বশিল্পীর নিজ হাতে তৈরি প্রাকৃতিক শিল্পকর্ম। এ যেন একাত্তরের নির্মম ভাস্কর্য।

– ঠিক ধরেছো নাতজামই। এ গাছ দু'টো কত লোকে কিনতে চেয়েছে, আমি সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছি। বলেছি– ওই স্মৃতিটা আমাকে পোড়ানোর জন্যে থাক। গাছ দু'টো আর আমি একই বয়সী। ওরাও পুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যন্ত্রণার স্মৃতি নিয়ে। আমিও পুড়ছি। আমিও সে আগুন পুষে রেখেছি বুকে আজ আটত্রিশ বছর। ওরা আমাকে টানে। যেখানেই থাকি, কখন যেন এখানে এসে পৌঁছে যাই।

বৃদ্ধের চোখে স্মৃতিকাতর জল আবিষ্কার করে বিকাশ। পা দু'টো অনড়। ঠোঁট দু'টো থরথর কাঁপছে। কথা ফোটে না মুখে। বুকের জমানো বাষ্প ঠেলে বৃদ্ধ বলে ওঠেন–

– সবিতা আর কবিতা আমার দুই মেয়ে। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সবিতা। আর কবিতা ক্লাস টেন-এ। আর তিন ভাই অশোক, অরূপ, অপূর্ব বেশ ছোট। অশোক কেবল প্রাইমারি ডিঙিয়ে হাইস্কুলে। একাত্তরের শুরুর কথা বলছি।

একটু থেমে চোখ মুছে আবার বলছেন–

– গঞ্জ থেকে বেশ দূরে এ জায়গা। গণ্ডগ্রাম বলে মোটামুটি নিরাপদ। ভেবেছিলাম মিলিটারি আসবে না এ গ্রামে। সব ভাবনাই কি সত্যি হয়? যা হবার, হলো। পালাবার পথ পেলাম না আমরা। আমাদের মারল না, পোড়াল না। শুধু লুট করে নিয়ে গেল যা ছিল সব। টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, মান-সম্ভ্রম সব।

একটু নীরবতা। গুমোট এক ভারি বাতাস কণ্ঠনালী চেপে ধরে। নরেশবাবু বলেন–

– তখন এ গাব গাছ দু'টো এ রকম পোড়া ছিল না। ঘন সবুজ ছিল। কী ছায়া ছিল তার। কত গাব ধরত এ গাছ দু'টোতে। সবুজের মধ্যে থোকা থোকা হলুদ; পাকা গাব। ছেলেপেলেরা পেড়ে পেড়ে খেত।

– সহ্য করতে পারছিলাম না এ যন্ত্রণা। শুধুই কেঁদেছি। সারাদিন ঘর থেকে বেরোয় নি দুই বোন। পাথর যেন। নির্বিকার। দু'চোখে দুই জলের ধারা শুধু। বিকেলে খুঁজে পাওয়া গেল না ওদের। সন্ধের সময় আবিষ্কার করলাম– সবিতা আর কবিতা দুই গাব গাছে দুইজন ঝুলে আছে। সে দৃশ্য ঈশ্বরের পক্ষেও বুঝি সহ্য করা কঠিন।

– নামানো হলো। নিথর দু'টো দেহ। হিমশীতল। সারা গ্রাম ভেঙে পড়ল কান্নায়। দুই গাছের গোড়াতেই দুইজনের চিতা জ্বলল। একই সাথে। একই সাথে ছাই হলো দু'টো সম্ভাবনা।

– এই হাতে মুখাগ্নি করেছি। এই হাতে। দ্যাখো, করতলে এখনও লেগে আছে লাল আগুন।

– এমন করুণ দৃশ্য কেউ কখনও দেখে নি।

– পরদিন আবার এল মিলিটারি। সবিতা আর কবিতাই যেন উদ্দীষ্ট। তাদের খুঁজে না পেয়ে বাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। আমরা পালিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু ওই গাব গাছ দু'টো পালাতে পারে নি। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল নির্ভয়ে। তাদের ক্রোধ পুড়িয়ে দিল সবুজ। এই দালান-কোঠা, গাছ-গাছালি সব। একটুকুও সবুজ বেঁচে ছিল না এই বাড়িতে। সব পুড়ে ছাই। এই পোড়া গাব গাছ দু'টো আমার সেই যন্ত্রণার সাক্ষী। ওরাই আমাকে বেঁধে রেখেছে এই প্রেতপুরীতে। এক পা নড়তে দেয় না। ওদের রেখে আমি কী করে কোথাও যাই?

পাড়ভাঙা নদীর মতো ঝুপঝুপ ভেঙে পড়েন অজিতবাবু কালস্রোতে। হিসেব মেলাতে পারে না বিকাশ, অজিতবাবু বিজিত না পরাজিত। কেবলই মনে হয় এ রকম লক্ষ অজিত ছড়িয়ে রয়েছে সারা বাংলায়। বিকাশ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে অভিশপ্ত কালো দু'টো অক্ষরের দিকে। বাংলা 'সাত' এর পিঠে বাংলা 'এক'। কালো ৭১। ৭১ এর কঙ্কাল। সূর্য ডুবে গেছে। ঘন সবুজও চলে গেছে অন্ধকারের কালোর অধিকারে। বিকাশ দেখতে পায় সামনে বিশাল কালো প্রেতাত্মার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে একাত্তর। এক মর্মন্তুদ স্মৃতিস্তম্ভ। গাঢ় কালো এক ইতিহাস। ধীরে ধীরে গাঢ় কালো অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে, মিশে যেতে থাকে কালো ৭১।

আর দেখতে পায়, ধূসর প্রকৃতির বুক চিরে সন্ধ্যার মতো সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে ধীর পায়ে সেদিকে এগিয়ে আসছে কে একজন। একা। করুণা। সর্বংসহা মহাকাল। কালো ৭১ এর পায়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে। বিকাশের কী হয়– সে দেখে– শত শত করুণা সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে এগিয়ে আসছে কালো অক্ষর দু'টোর দিকে। শত শত নয়, হাজার হাজার। লক্ষ লক্ষ। সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে অগণিত সাদা শাড়ির মিছিল। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মাথাটা টলে। আগুনের মেলা। সকল প্রদীপ মিলে যেন এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। দাবানলের সৃষ্টি করে। পোড়া ৭১ কি আবার পুড়বে?

খাটাশ

এক

ধড়মড় করে উঠে বসে খাদিজা। বুক ঢিব্ ঢিব্ করতে থাকে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে তার কেমন ভয় ভয় করে। গলা শুকিয়ে কাঠ। চারদিকে কালোজামের মতো অন্ধকার। হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক ভয়ার্ত ডাক আর পাখা ঝাপটানো তাকে আতঙ্কিত করে তোলে। সর্বনাশ! ঘরে খাটাশ ঢুকিছে। বারান্দায় হাঁসের বাক্স। তাতেই খাটাশের লোভ। পাটখড়ির বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়েছে ঘরে। এখন উপায়? বাতি খুঁজে পেলেও ম্যাচ খুঁজে পেতে একটু দেরি হলো খাদিজার। কাজের সময় হাতের কাছে কাজের জিনিস পাওয়া যায় না।

আলো নিয়ে বারান্দায় যেতেই দিশেহারা খাটাশ এক ছুটে পালাতে গিয়ে এক লাফে আচমকা পড়ল এসে খাদিজার বুকে। ঘটনার আকস্মিকতায় খাদিজা হকচকিয়ে যায়, বাতি নিভে যায় এবং মুখ দিয়ে ভয়ার্ত ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে আসে– 'আল্লাহ্'। এবং এ অবকাশে খাটাশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় আরও দ্বিগুণ বেড়া ভেঙে। খাদিজার বুকে দুরন্ড় ঢেঁকির পাড়। হাঁসগুলো ভয়ে নিশ্চুপ। জামাল বাড়ি ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একা খাদিজা কেমন অসহায় বোধ করে। মৃগী রুগীর মতো কাঁপতে থাকে ভয়ে।

খাটাশ পালাতে না পালাতেই ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ধারাল চকচকে তলোয়ারের মতো তিন ব্যাটারি টর্চের এক তির্যক আলো এসে পড়ে হাঁসের বাক্সের ওপর। খাদিজার চিৎকারই যেন প্রতিফলিত হয়ে ব্যুমেরাঙের মতো টর্চের আলো হয়ে ফিরে আসে খাদিজার পায়ের কাছে। টর্চের আলোটা স্থান পরিবর্তন করে পা বেয়ে ওপরের দিকে ওঠে এবং উঠতে উঠতে মুখে এসে থামে। দু'এক সেকেন্ড; তারপরই আলোর তীরটা পিছলে পড়ে খাদিজার বুকে এসে বিদ্ধ হয় এবং কিছুক্ষণ স্থির থাকে, যেন জিওলের আঠায় লেগে থাকা এক টুক্‌রো স্বচ্ছ সাদা কাগজ। ঘুম ভেঙে উঠে আসা রাত দশটার খাদিজা ছিল এলোমেলো শাড়িতে জড়ানো জীবন্ত এক ক্যানভাসের ছবি। দ্রুত তাই বুকের আঁচল টেনে দেয় কেমন এক ভীত-বিহ্বল আরক্তিম আড়ষ্টতায়। মুখ পাংশু হয়ে যায়। এবং ঠোঁট দু'টো শক্ত মমি। তাই কোনো কথা বেরোয় না। হঠাৎ ঠাটা পড়ার মতো বাজখাই এক গলা খাঁকারি এবং পাহাড়ের গুহা থেকে বেরিয়ে আসা আওয়াজের মতো কণ্ঠস্বরে কথা শোনা যায়– 'আমি ইমাম সাহেব, রজব আলি। কী হইয়েছে খাদিজা?'

খাদিজা কিছুক্ষণ বাক্‌রহিত, তারপর ঢোঁক গেলে এবং পরে বলে– 'খাটাশ। ঘরে খাটাশ ঢুকিছে।' চমকে ওঠে ইমাম সাহেব। কথাটা তার কানে গরম তেলের ফোঁড়ন ঢালে। আঁৎকে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো– 'কথাডা তারে কয় নাই তো খাদিজা?' পর মুহূর্তেই স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে বলল– 'তাই কও। কোনানে খাটাশ?' তখনও খাদিজার বুকে অসম্ভব ঢেঁকির পাড়– ঢিব্ ঢিব্ । মুখে কোনো কথা না বলে আঙুল তুলে দেখাল– সামনে। সামনে তখন খাটাশ অনুপস্থিত। তবে অস্তিত্বের চিহ্ন বর্তমান।

টর্চের বৈদ্যুতিক আলোটা এতক্ষণে খাদিজাকে ছেড়ে বাক্সের ভাঙা দরোজাটার ওপর এসে পড়ল। হাঁসগুলো ভেতরে জাড়োসড়ো। বাইরে অসাধারণ চিত্রকলার সৃষ্টি। দুধের মতো সাদা হাঁসটা রক্তে মাখামাখি পড়ে আছে নিথর। গোটা দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে পালিয়ে গেছে খাটাশ। খাদিজা তাকিয়ে রইল তার প্রিয় হাঁসটার রক্তাক্ত দেহটার দিকে। আর ইমাম খাদিজার দিকে। খাদিজার হত-বিহ্বলতার সুযোগে তার একটা হাত চেপে ধরল ইমাম সাহেব। এবং কিছুটা ঘনিষ্ঠ হতে গেলে খাদিজার ডান হাতটা হঠাৎ সচল হয়ে ওঠে এবং ইমামের হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়ে যায় মাটিতে। কিন্তু আলোটা নেভে না। টর্চের আলোটা গুলীবিদ্ধ সৈনিকের মতো কাৎ হয়ে শুয়ে থাকে মাটিতে। ইমামের গালভর্তি মখমলের মতো দাড়ি থাকায়, ঠাস্ করে কোনো শব্দ হয় নি; কিন্তু ব্যথা লেগেছিল ঠিকই এবং আঁতে ঘা লেগেছিল তারচে বেশি; অপমানিত বোধ করেছিল খুব। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি না থাকলেও ইমাম এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল– কেউ তাকে দেখে ফেলল কি না। এর আগে

কখনও কোনো মহিলার হাতের থাপ্পর খায় নি ইমাম, তাই কেমন একটা ঘৃণা-রাগ-লজ্জা মেশানো অনুভূতি হলো তার। চাপা অথচ রাগত স্বরে বলে উঠল– 'কাজটা ভালো কইরল্যা না খাদিজা।'

বারান্দার ঘরে তখন অন্ধকার, সাদা হাঁসের রক্তাক্ত লাশ, শুয়ে থাকা টর্চ-লাইট এবং মুখোমুখি পাংশুল খাদিজা ও হিংস্র ইমাম। ইমাম হঠাৎ ক্রুদ্ধ আক্রোশে শক্ত পেশীতে খপ্ করে জাপটে ধরে খাদিজাকে– যেন একটা সাদা হাঁসকে ধূসর খাটাশ। ফুঁসতে থাকে ইমাম– 'এ্যাত্তো ত্যাজ? ত্যাজ ভাইঙ্গ্যা দেবো'। যাঁতাকলে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো গোঙাতে থাকে খাদিজা। ছটফট করে। ইমাম যেন পদ্মপুকুরে উন্মত্ত এক মোষ। অন্ধকারে সাদা হাঁস আর রক্ত দৃশ্যমান নয়। তবু গন্ধ জেগে থাকে। একটা সাদা হাঁসের মৃত্যু হয়। মৃত্যু থেকে বেঁচে যাওয়া হাঁসগুলো আতঙ্কে ছটফট করে ওঠে এবং বার কয়েক ডেকে চুপ হয়ে যায়।

দুই

সে রাত চলে গেলেও ইমামের জীবন থেকে, তার মন থেকে রাগ গেল না। মেয়েছেলের হাতের চড় যেন জোঁকের মতো লেগে রয়েছে তার গালে। শুষে শুষে তার রক্ত খায়। সহজে হজম হবার নয়। ইমামের মনে ফন্দি-ফিকিরের আনাগোনা। প্রতিশোধ সে নেবেই। কঠোর প্রতিশোধ। ভাবতে ভাবতে দেখতে পায় জামালকে। সন্ধের আগে আগে ফিরছিল বাজার থেকে। মসজিদের কাছে আসতেই ডাক দেয় রজব আলি– 'শুনিয়্যা যাও জামাল, কতা আছে। বাজারে কিছু শুনিছো মিলিটারিগে ব্যাপারে?'

– শুনিছি। গোপালগঞ্জ শহরে নাকি মিলিটারি আসিছে। আগুন দিয়া নাকি ঘর-বাড়ি পোড়াইয়া দিতিছে। ঘাঘর বাজারেও নাকি শিগ্‌গিরই আসিয়্যা পড়বো। শিগ্‌গিরই নাকি আক্রমণ হতি পারে।'

– কী কও, আক্রমণ! পাকিস্তানি আর্মি; হ্যারাতো ফেরেস্তা। আমাগে উদ্ধার করতি আসিছে। তুমি কতিছো আক্রমণ? যাক গে, সেই কতা কতিইতো তোমারে ডাকিছি।

– মানে?

– আমাগে এলাকায় মিলিটারি আইসবো, হ্যাগো পথ-ঘাট চিনান লাগবি না? হ্যারা আমাগে মেহমান। আদর-আপ্যায়ন করতি হবি না? সেই জন্যিইতো আমরা একটা কমিটি করিছি। সারা দ্যাশে এই কমিটি হতিছে। নাম শুনিছো? কান্তি কমিটি।

– শান্তি কমিটি? মানে? শান্তির কাজ কইরবে?

– তাহলি আর কতিছি কী? দ্যাশে কুনো অশান্তি হতি দিবো নানি। আমরা মালাউনগে একটা লিস্টি তৈয়্যার কইরবো, আর একটা মুক্তিযোদ্ধাগে পরিবারের। আর একটা লিস্টি করতি হবিনে– মালাউনগে সাথে যারা মিলামিশা করে, আর যারা স্বাধীনতা চায়, তাদের।

– তাতে কী হবি নে?

– মিলিটারিগে হাতে লিস্টি ধরাইয়া দেবানি। বাছি বাছি তাগে মারবে, তাগে বাড়িঘর পোড়াবে। নালিতো হক্কলেরেই মাইর‍্যে ফেলবো।

– কী কতা কলা ইমাম? এডা কি মাইনসের মতো কতা কলা?

– মানে? আমরা শান্তি চাই। যারে তারে মারবে ক্যান? শুনিছো, আমরা শান্তি কমিটির একটা শাখা বানাইছি। তুমি আমাগে দলে নাম লেখাও। নালি কলাম বাঁচতি পারবা নানি।

– তোমাগে এ কমিটিতি আমি নাই। গ্যালাম।

– অতো দেমাগ ভালো না কলাম, জামাল। তোমারে চিনি না ভাবিছো? মালাউনগে সাথে বেশি পিরিত তোমার। সেই জন্যিই রাজি হলা না। ফল কিন্তু ভালো হবি নানি জামাল।

জামাল ফেরে না। পেছনে ইমামের গর্জন শোনে–

– রাইতের বেলা মেম্বাররে নিয়া তোমাগে বাড়ি যাবানি কলাম। ভাবিয়া দেইখো।

মাথায় বাজারের ধামা নিয়ে জামাল হন হন করে বাড়ির দিকে ছোটে। বন্ধু সনাতনের সঙ্গে দেখা পথে। তাকে সাথে নিয়ে বাড়ি এলো। এক জোড়া হাঁস বিক্রি করে বাজার করে এনেছে। ইলিশ মাছ কিনেছে একটা। সনাতনকে না খাইয়ে ছাড়বে না সে। খাদিজাকে মাছ ভাজতে বলে দুই বন্ধু বসেছে গল্পে। ইলিশ ভাজার গন্ধ যেন সারা ঘরে ছড়িয়ে দুই বন্ধুকে জড়িয়ে রেখেছে। ছেলেবেলা থেকেই দুই বন্ধুতে গলায় গলায় ভাব। এক হুঁকোয় তামাক খায়, এক গেলাসে জল খায়, এক থালায় ভাত খায়। কখনও জাত-পাতের প্রশ্নও মনে আসে নি। হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্যটা কোথায়– তাও তারা বোঝে না। মাছ ভাজার ঘ্রাণের সাথে খাদিজার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে– হাত ধুয়ে নাও সনাতনদা, খাবার দিতিছি। দূরে কোথাও শেয়াল ডেকে ওঠে। অজানা আতঙ্ক ছড়ায়। বাঘ ডাকার আগে যেন ফেউ ডাকে।

গরম গরম ভাতে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ইলিশের তেল আর গরম গরম মাছ ভাজা। পরম তৃপ্তিতে খেয়ে হুঁকোয় তামাক সেজে বিশ্রাম নিচ্ছে দুই বন্ধু। নানা গল্প করছে। পাশেই বসে খাচ্ছে খাদিজা। বিছানায় ঘুমুচ্ছে তিন মাসের ছেলে রমজান। মাঝে মাঝে চমকে নড়ে উঠছে। আবার ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যে কখনও একা একা হেসে উঠছে। খাদিজার বুকটা ভরে ওঠে। তাদের প্রথম সন্তান রমজান। গরিবের ছেলে। তবুও ছেলেকে নিয়ে তাদের কত আশা– লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করবে। ছেলে চাকরি করবে। তাদের কোনো অভাব থাকবে না। ভাবনায় তলিয়ে যায় খাদিজা।

জামাল বলছে– শুনিছো সনাতন, চারিদিগে মিলিটারিগে টর্চার চলতিছে। তার মইদ্যে রজব আলি ইমামরা শান্তি কমিটি কইরছে। কার কার বাড়িঘর আগুন জ্বালি পুড়াইবো, তার লিস্টি করতিছে। আমারেও শাশালো। কলো– রাইতে যাবানি তোমাগে বাড়িতি। ঘাঘর বাজারেও নাকি শিগ্‌গিরই আইসবে।

– কতাডা আমিও শুইন্যাছি।

– এখন তালি উপায়?

বর্ষার ভরা নদীর স্রোতের মতো খাদিজার আবেগ-বিহ্বল ভাবনা চলতে থাকে রমজানকে ঘিরে। রমজান মাসে মাসে চাকরির টাকা পাঠাবে। তাদের হাঁসের বাক্সটা আরও বড় এবং মজবুত করবে। যাতে খাটাশ ঢুকতে না পারে, তাই খড়ির বেড়ার বদলে টিনের বেড়া দেবে। অবশ্য তখন এই খড়ের ঘরও থাকবে না। টিনের ঘর হবে। এ রকম কোনো এক রাতে খাদিজা খেতে বসবে, এমন সময় রমজান ছুটিতে বাড়ি আসবে। ফিরতে ফিরতে তার রাত হয়ে যাবে বলে টর্চ জ্বালিয়ে আসবে। বাড়িতে উঠেই রমজান তাকে ডাক দেবে– আম্মাজান–

খাদিজা কেমন একটা ধাক্কা খায়– রমজান এরকম বাজখাঁই গলায় ডাক দেয় ক্যান? কেমন ইমাম হারামজাদার গলার মতো আওয়াজ। আবার ডাকে–

আ . . . জ্ . . . জামাল, বাড়িতি আছো?

সেই টর্চের তির্যক আলো এসে পড়ে খাদিজার শূন্য থালে, থাল থেকে মুখে। সংবিৎ ফিরে পায় খাদিজা– এ যে ইমাম। রমজানতো তিন মাসের, বিছানায় শোয়া। এতক্ষণ সে ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিল। বাস্তবে ফিরে আসতে দেরি হয় না তার। হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠে শূন্য থালাটা নিয়ে চলে গেল খাদিজা।

রজব আলি ইমাম এলাকার মেম্বর আক্কাস এবং তিন চার-জন লোক সাথে নিয়ে হাজির হলো এসে জামালের বাড়ি। এদের আসাটা জামালের পছন্দ না হলেও এলাকার মেম্বর এসেছে বলেই খাতির করতেই হলো। বসতে বলল। সনাতনের দিকে ভ্রুকুটি হেনে তারা বসল। সনাতন এখানে আর থাকাটা সমীচীন মনে করল না। বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। ইমাম কটাক্ষ করে বলল–

– ও ব্যাটা মালাউনেরপো তোমাগে বাড়িতি ঘুর ঘুর করে ক্যান? এ্যাতো কেষ্ট পিরিত কীসির?

মেম্বর– হিন্দুগে সাথে কি মুসলমানের বন্ধুত্ব হয়? শুনিছো কুনোদিন? ত্যালে আর জলে কি কুনোদিন মিশ খায়?

ইমাম– এইডা হলো গিয়া পাকিস্তান। মালাউনগে জায়গা নাই।

জামাল– কী কতি চাও তোমরা?

ইমাম– কতাডা জলের নাহাল সোজা। মালাউনগে সাথে পিতলা পিরিত ছাইড়্যা আমাগে দলে যোগ দ্যাও। নালি কলাম বিপদ আছে। আমরা পাকিস্তানের শত্রুগে লিস্টি করতিছি। কাউরি রেহাই দেবে নানি কলাম।

মেম্বর– আমাগে দলে আলি তোমার কুনো ক্ষেতি হবি নানি, বরং লাভ হবি নে। হিন্দুগে ট্যাহা-পয়সা, সোনা-দানা বেবাক আমরা কাড়িয়্যা নেবো। আমাগে সাথে থাকলি, তুমিও তার ভাগ পাবা নে।

জামাল– তোমরা এ্যাত্তো খারাপ? আমি ওসব পারবো নি। আমি তোমাগে দলে নাই। তোমরা এ্যাহোন যাতি পারো।

ইমাম– তাড়াইয়্যা দিতিছো? এইডার ফল কলাম ভালো হবি নানি জামাল। সাবধান কইর‍্যা দিতিছি– মালাউনগে সাথে বেশি খাতির দিও না।

জামাল– সেইড্যা আমার ব্যাপার। আমি কী কইরবো, কী না কইরবো, তা তোমাগে কাছে জিগাতি যাবো নানি।

আড়ালে দাঁড়িয়ে এইসব শুনছিল খাদিজা। ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। এ কীসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল ইমাম? তার দু'চোখের উদ্বেগ আর আশঙ্কার আতঙ্ক নিয়ে কাঁপছিল পিদিমের শিখা। চোখের সামনে সে যেন সর্বনাশের আগুন দেখতে পায়। চিন্তিত জামালও। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে দু'জনে বিছানায়। কোনো কথা বলে না কেউ। যার যার মতো করে ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকে। ভাবনা যেন জোঁকের মতো লেপ্টে থাকে দু'চোখে। খাটাশ ঠেকাতে বেড়ার ফাঁকে ছেঁড়া জাল পেতেছে খাদিজা। তবু নিশ্চিন্ড় হতে পারে না। ঘুম আসে না। ঘুম আসে না জামালেরও। শুয়ে শুয়ে শঙ্কা, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার জাল বোনে দু'জনে।

তিন

চৈত্র মাসে ফাটা শিমূল তুলোর ওড়াউড়ির মতো বাতাসে মিলিটারি আসার গুজব ভেসে বেড়ালেও কারও মনে তখনও কোনো ভয় জাগে নি। আতঙ্কের ভূতটা সেদিনই প্রথম ঢুকে পড়ল মানুষের মনের মধ্যে। সনাতনের বাড়িতে ছিল সেদিন তেন্নাতের (ত্রিনাথের) মেলা। প্রায় শ'খানেক লোক উপস্থিত। সনাতনের বাড়ির যে কোনো অনুষ্ঠানে জামালের থাকা চাইই। আজও ছিল। ঈদ কিংবা পূজা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ অঞ্চলের সকল মানুষের উৎসব। জাত-পাত কিংবা ছোঁয়াছোঁয়ির কোনো বালাই নেই। সবার সমান অংশগ্রহণ। ঢোল বাজাচ্ছে বুড়ো রহিম চাচা। আর তার ছোট ছেলে বেলাল বাজাচ্ছে করতাল। তেন্নাতের গান অবশ্য গাইছে নীলকান্ত মজুমদার। এতক্ষণ তেন্নাতের কাহিনি বর্ণনা করছিল রমেন মল্লিক।

এবারে গাঁজা টানার পালা। ছেলে বুড়ো সবাই গাঁজার কল্কিতে টান মারে এ সময়। কেউ কাউকে নিষেধ করে না। কেউ কিছু মনেও করে না। এটা হলো শিবের প্রসাদ। প্রতীকী বটগাছ হিসেবে বড় একটা বটের ডাল পোঁতা হয়েছে উঠোনের ঠিক মাঝখানে। বটতলা মেলা। বটগাছের চারদিকে সবাই গোল হয়ে বসেছে বটগাছটা ঘিরে। তিনটে কল্কিতে একজনে গাঁজা সাজিয়ে, গাঁজার গুলীতে আগুন দিয়ে ফৎ ফৎ করে কয়েকটা টান মারে। আগুনটা জ্বলে উঠলে বাঁদিকের মানুষদের কাছে দেয়। সে টান দিয়ে তার বাঁদিকের লোকটার হাতে দেয়। এভাবে পরপর তিনটে কল্কে ডান থেকে বামে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। কল্কে বামপন্থী। সব সময় ডান

থেকে বামে ঘোরার নিয়ম। কখনও উল্টোদিকে ঘুরতে পারবে না। কেউ যদি গাঁজায় দম দিতে না চায় বা নেশা হয়েছে বলে আর না টানতে চায়, তাহলে কল্কেটা দু'হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বাঁ পাশের লোকটার হাতে দেয়। এভাবে গাঁজা নিঃশেষ হবার আগ পর্যন্ত সারা আসরে তিনটে কল্কে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। গাঁজার দমের সময় কথা বলার বা কোনো শব্দ করার নিয়ম নেই। সবাই ব্যোম্ মেরে বসে থাকে। আর গাঁজা পোড়ার চড়্ চড়্ শব্দ বা গাঁজা টানার ফৎ ফৎ শব্দ শোনা যায়। কখনও সখনও অবশ্য গাঁজায় দম দেবার কারণে দু'একজনের পশ্চাদ্দেশ দিয়ে হঠাৎ বায়ু নির্গত হয়ে যায় এবং পুম্ করে একটু শব্দ হয়। ছেলে ছোকরারা আবশ্য এতে ভারি মজা পায়। হেসে ওঠে। এ ছাড়া নৈঃশব্দ। কেউ কেউ অবশ্য বমিটমিও করে ফেলে। অনেক সময় দু'একজন মাতাল হয়ে মাতলামি শুরু করে। সেদিন হরিচানদের বাড়িতে গণ খুড়ো হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে দালানের সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে বলে– 'দে, আমার মাথায় উঠায়ে দে। দালানটারে মাতায় কইর‍্যা নাচি।' মাঝে সাজে এ রকম দু'একটা ঘটনা ছাড়া সাধারণত গাঁজার দমের সময় নিঃশব্দ থাকে।

গভীর রাতে সনাতনের বাড়িতে যখন গাঁজার দম চলছিল, আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে তখন বিকট এক শব্দ এলো গোপালগঞ্জের দিক থেকে । রাতের নৈঃশব্দ এবং গাঁজার দমের নীরবতায় শব্দটা যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে আছড়ে পড়ল আসরে। এবং আরও চতুর্গুণ নীরবতা হয়ে নেমে এলো সেখানে। ঘটনা আন্দাজ করতে কোনো অসুবিধে হলো না কারো। সম্ভাব্য সর্বনাশের আতঙ্কে চুপসে গেল সবার মুখ। দই-খই আর খেজুরে গুড়ের তেন্নাতের মেলার সুস্বাদু প্রসাদ আজ আর কারো মুখে ভালো লাগল না। বিস্বাদ হয়ে গেল মুহূর্তে। কোনোমতে প্রসাদ খেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেলা ভঙ্গ দিয়ে যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সবার শেষে গেল জামাল। সনাতনের মুখটা শুকনা। জামাল চিন্তান্বিত। যাবার সময় বলে গেল– 'সাবধানে থাকিও বন্ধু। সময়টা কলাম ভালো না।' ভাঙা মেলার মাঠে বসে থাকে সনাতন আর সনাতনের বউ। বুড়ো বটগাছ তাদের কোনো ভরসা দিতে পারে না।

চার

দু'দিন পেরুতে না পেরুতেই এক হাটবার ঘাঘর বাজারে এসে থামল ছোট্ট একটা লঞ্চ। শক্ত লম্বা একটা তক্তা লঞ্চ থেকে বেরিয়ে বাজারের মাটি ছুঁলো। তার ওপর দিয়ে সদর্পে লঞ্চ থেকে আগে আগে নামল মসজিদের ইমাম। পরনে বিশাল আলখেল্লা। মাথায় টুপি। পায়ে বুট। চোখ দু'টো হিংস্র হায়েনার মতো। তার থেকে যেন ক্রুদ্ধ আগুন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। ইমামের দর্পিত বুট মাটি স্পর্শ করল। পেছন পেছন নামল জলপাই রঙের পোশাক পরা কতগুলো মিলিটারি। নেমেই দুড়্দাড়্ তারা ছড়িয়ে পড়ল বাজারে। চায়ের দোকানে ঢুকেই গুলী করে মারল খালেক চেয়ারম্যানকে। পাশেই ছিলেন হাইস্কুলের হেডমাস্টার সতীশবাবু। তাকে খুন করল। সাথে সাথে হুলুস্থুল পড়ে গেল বাজারে। সবাই ছুটে পালাতে লাগল। মিলিটারিরা ব্রাশ ফায়ার করতে লাগল দিগ্বিদিক। এ সুযোগে স্টোভের কেরোসিন ঢেলে চায়ের দোকানে আগুন ধরিয়ে দিল ইমাম। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল নিবারণের চায়ের দোকান। ছেঁড়া পাউরুটি কিংবা ভাঙা বিস্কুটের লোভে চায়ের দোকানের সামনে শুয়ে থাকত যে কুকুরটা, ভয়ে খেঁউ খেঁউ করতে করতে ছুটে পালাল। আদিম উল্লাসে মেতে উঠল ইমাম। ইমামের মেহেন্দি লাগানো দাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের রঙ। আগুনের লাল আভায় ইমামের মুখটা ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখায়। জ্বলন্ত চায়ের দোকানের সামনে ইমামকে মনে হয় আগুন-মানুষ। যেন জ্বলন্ত আজরাইল।

গুলীর শব্দ, আগুন, ধোঁয়া, পোড়া গন্ধ, দৌড়োদৌড়ি, হুড়োহুড়ি– সব মিলিয়ে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। চিৎকার, চেঁচামেচিতে আকাশ-বাতাশ প্রকম্পিত। ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষের পীড়নে নদীজল তোলপাড়। হিংস্র জানোয়ারের মতো মিলিটারিরা তাড়া করছে সবাইকে। ছুটছে মানুষ। নারী-পুরুষ। কুকুর-বেড়াল। গরু-ভেড়া। প্রাণভয়ে।

নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ দিচ্ছে বিশাল ডুব। কেউ জাগছে, কেউ জাগছে না। মুহূর্তে লাল হয়ে গেল সলধা নদীর জল। হোলির দিন নয়, তবু মনে হবে– আজ পৃথিবী মেতেছিল অদ্ভুত হোলি খেলায়।

ইমামের সে কী পৈশাচিক উল্লাস। যেন সে গোটা পৃথিবীর অধীশ্বর, তার হুকুমে চলবে জগৎ-সংসার। যে যার প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে দোকানদাররা। পড়ে রয়েছে দোকান, মালপত্র; খোলা রয়েছে ক্যাশবাক্স। ইমামের পকেট উপচে পড়ছে সে টাকায়। হ্যারিকেন ঝড়ের মতো সব তছনছ করে দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিদায় নিল মিলিটারিরা। থেকে গেল ইমাম। পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরল।

দাউ দাউ জ্বলছে ঘাঘর বাজার। এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে লাশ। কেউ রক্তাক্ত, কেউ পোড়া বেগুনের মতো অর্ধপোড়া। কেউ গুলীবিদ্ধ অর্ধমৃত কাতরাচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। কেউ করছে আহাজারি স্বজন কিংবা সম্বল হারিয়ে। হাটুরে কুকুরগুলোও যেন ভয়ে স্তম্ভিত। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে দাউ দাউ আগুন। পশ্চিমের অস্তপ্রায় সূর্যের রঙের সাথে যেন মিশে গেছে পুবের ঘরপোড়া আগুন, দিগন্ত থেকে দিগন্তে। সূর্য নিভে গেলেও রয়ে গেল আগুনের দগ্‌দগে ঘা।

গ্রাম জুড়ে স্বপ্নভাঙা মানুষের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যেন বইছে বাতাস। উদ্বেগ আর আতঙ্কে ওষ্ঠাগত মানুষের প্রাণ। শুক্‌নো শুক্‌নো করুণ মুখগুলো যেন শ্মশান থেকে উঠে আসা নিস্প্রাণ শবযাত্রী, ছাইভস্ম মাখা। গোটা গ্রামটাই যেন শ্মশান-চত্বর। সনাতন হাটে গেছিল। পায়ে চোট লেগেছে ছুটতে গিয়ে। ভাঙা শিশি বোতলে পা কেটে গেছে অনেকখানি। খবর পেয়ে জামাল গেছে তাকে দেখতে। রাতেই। বাড়িতে একা খাদিজা। কেরোসিনের পিদিম জ্বেলে তিন মাসের শিশুপুত্র রমজানের পাশে বসে অপেক্ষা করছে জামালের জন্য। প্রথমবারের মতো বাজ পাখি ডেকে ওঠে– কড়ু . . . ক.ড়ু.ড়ু.ড়ু.ড়ু . . . . . । রাত প্রথম প্রহর। হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোর ঝিলিকে চমকে ওঠে খাদিজা। পুরনো সেই টর্চের আলো নতুন করে এসে উঠোনে পড়ে। এ আলো তার চেনা। গায়ে নুন পড়া কেঁচোর মতো মুহূর্তে কুঁকড়ে যায় সে। বাজপাখির মতো বাজখাই কণ্ঠস্বর হেঁকে ওঠে– 'জামাল, বাড়িতি আছো নি?' খাদিজার গলা কেঁপে ওঠে–

– 'না। বাড়িতি নাই।'

– কনে গেছে?

– সনাতনদার বাড়িতি। মিলিটারিগি তাড়া খাইয়্যা পায়ে খুব চোট লাগিছে।

– কও কী? বাচিয়্যা আছে, গুলী লাগি নাই?

বলতে বলতে ইমাম ঘরে উঠে খাদিজার পাশে বসে। খাদিজা খাটাশ দেখা হাঁসের মতো চুপ হয়ে যায়। চোখ থেকে চেতনা উড়ে যায়। বারান্দায় একটা সাদা হাঁস, আর ধূসর এক খাটাশ। আর সব ঝাপসা।

– জামালরে বলিও, মালাউনগে সাথে মিলামিশা করলি ফল কলাম ভালো হবি নানি।

খাদিজার মনে হয়– সুদূর কোনো দিগন্তের ওপার থেকে ভেসে আসছে কার অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর। ভয়াল এক তীরের মতো তা তাকে আমূল বিদ্ধ করে।

– বাঁচতে চালি আমার সাথে দ্যাখা কইর‍্যা শান্তি কমিটিতি য্যান নাম লেখায়। নালি বেগতিক হবি নে।

খাদিজা যেন বাস্তবে ফিরে আসে। স্পষ্ট শুনতে পায়– এ ইমামের কণ্ঠস্বর। কঠিনভাবে শাসাচ্ছে। ভয়ে তার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। এ কীসের ইঙ্গিত দেয় ইমাম? একটা ফড়িং উড়ে এসে পড়ে ইমামের পায়ের কাছে। কচি ধানের শীষের মতো গাঢ় সবুজ। সুন্দর। খপ্ করে ফড়িংটাকে ধরে ফেলে ইমাম। দু'আঙুলে চেপে ধ'রে হঠাৎ পিদিমের আগুনে ঢুকিয়ে দেয় ফড়িংটাকে। ফড়িংটা ছটফট করে ওঠে। কেঁপে ওঠে খাদিজা। মনে হলো, তার হৃৎপিণ্ডটাই যেন আগুনে ঢুকিয়ে দিল ইমাম। পোড়া মরিচের মতো এক সময় নিস্তেজ হয়ে যায়। দুর্গন্ধ বেরোয়। খাদিজার ওয়াক আসে। আঁৎকে ওঠে ইমামের কথায়।

– তালি কলাম এরোম্ পুইড়্যে মরতি হবি নে।

পাঁচ

প্রতিদিন মানুষ এখন লঞ্চের শব্দ শোনে সলধা নদীতে। রোজ আতঙ্ক হয়ে এ শব্দ নদী দিয়ে আসে, যায়। কোনো পাড়ে ভিড়ে হয়ত জ্বালায় ঘর-বাড়ি। গুলী করে মানুষ মারে। মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে যায়। আর তারা ফেরে না। তাদের আর্ত চিৎকারে বাতাস কেঁপে ওঠে। টলে ওঠে মাটি, বৃক্ষ। টলে না মিলিটারিদের পাষাণ হৃদয়। তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। স্বজনের সামনে জাপটে ধরে চুমু খায়। বাবা-মার সামনে মেয়েকে উলঙ্গ করে তার গোপনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেয় বন্দুকের নল। মানুষ ধরে ধরে লঞ্চে তুলে হাতের তালু আর পায়ের গোড়ালি ছিদ্র করে, মোটা গুণা দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে দেয় নদীতে। টুপ্ করে ডুবে যায় জীবন্ত মানুষ। এভাবে নিখোঁজ মানুষেরা দু'চারদিন বাদে পচে ভেসে ওঠে জলের ওপরে। কচুরিপানার মতো ভাসতে থাকে পচাগলা বিকৃত লাশ। শুশুক আর মাছদের কাড়াকাড়ি পড়ে যায় লাশ নিয়ে। ঠুক্রে ঠুক্রে খায়। দুর্গন্ধ ছড়ায়। আতঙ্ক ছড়ায়। শোক আর দুর্গন্ধে এলাকার বাতাস ভারি। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে দূরে। কেউ কেউ চলে যাচ্ছে ভারতে। কেউ কেউ ভিটেমাটি কামড়ে পড়ে থাকছে মরে। সনাতনরাও ভারতে চলে যাবে ভাবছে। কিন্তু তার পা এখনও সারে নি। হাঁটতে অসুবিধে। তাই যেতে পারছে না। সকাল হলেই মিলিটারির ভয়ে খোঁড়া পা টেনে টেনে পালাতে যায় বিলের পাটক্ষেতের গভীরে। ফিরে আসে সন্ধ্যায়, আবার একটা সকাল হবার আশঙ্কায়। হঠাৎ মিলিটারি এসে তাড়া করলে খোঁড়া পা নিয়ে ছুটতে অসুবিধে হবে বলে সকালেই পালাতে চলে যায় সনাতন।

ছয়

মরিচের ফলন খুব ভালো এবার। জবা ফুলের মতো লাল লাল মরিচ পেকে আছে খোলা ভরে। দুপুরের রোদ তেঁতে উঠেছে। এখনও লঞ্চের শব্দ শোনা যায় নি। আজ আর মিলিটারি আসবে না মনে হয়। যে দিন আসে, সাধারণত নাশ্তার বেলার মধ্যেই ভট্ ভট্ শব্দে এসে হাজির হয়। মিলিটারিরা দৌড়তেও পারে খুব। লাফ দিয়ে পাড়ে নেমেই শিকারী চিতার মতো দৌড় লাগায়। তারা সাঁতার জানে না। জামালের মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়– একদিন তারা নেমে গেলে, একটা কুড়োল নিয়ে দৌড়ে গিয়ে লঞ্চে উঠে তলিটা ফাটিয়ে দেয়। সাহসে কুলোয় না। আজ আসার সময় চলে গেছে তাদের। একটা দিন পাওয়া গেল। এই ভরসায় দু'টো ধামা নিয়ে বাড়ির পাশের খোলায় পাকা মরিচ তুলতে গেছে জামাল আর খাদিজা। রমজানকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে ঘরে। মরিচ তোলার ফাঁকে ফাঁকে খাদিজা এসে রমজানকে দেখে যায়। ঘুমের মধ্যেই রমজানের মুখে তুলে দেয় মাই, দুধ খাইয়ে আবার চলে যায় খোলায়। বেশ মজা লাগে খাদিজার। কী সুন্দর ছোট্ট ঠোঁটে ঘুমের মধ্যে চুঁক চুঁক করে মাই টানে। ওর মুখের দিকে তাকালে খাদিজা সব কষ্ট ভুলে যায়। রমজান তার সাত রাজার ধন এক মানিক, সারা জাহানের হাসি। হীরের টুক্রো ছেলেটা তার গোটা কলজে। দুধ খাওয়ানো শেষে দু'পাশে দু'টো ছোট্ট কোলবালিশ দিয়ে খাদিজা আবার ফিরে যায় খোলায়।

মরিচ তোলার ফাঁকে এক সময় প্রশ্ন করে খাদিজা–

– সনাতনদারা তালি চলিই যাবে?

– হ। প্রাণে বাঁচতি হলি পালানোই ভালো।

– আমাগেওতো রেহাই নাই। ইমাম হারামজাদা সিদিন কতো কী কলো? আমারতো ভয় হতিছে।

– কী যে করি, তা ভাবি কূল পাতিছি না। সনাতনদের সাথে ইন্ডিয়াতেই চলি যাবো না কি? শুনতিছি কতো মানুষ চলি যাতিছে। আবার মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিয়্যা যুদ্ধ করতি ফেরৎ আসতিছে দ্যাশে। যুদ্ধে যাবো নাকি, তাই ভাবতিছি। দূরে লঞ্চের শব্দ শুনে আঁৎকে ওঠে খাদিজা–

– লঞ্চের শব্দ মনে হতিছে? তালি কি মিলিটারি আসি পইড়লো?

– কী জানি? বেলাতো গড়িয়্যে গেলো। মিলিটারিগে আসার সময় কি আর রইয়েছে?

– তালি ভট্‌ভটির আওয়াজ হতিছে ক্যান?

এরই মধ্যে দূরে শোরগোল। চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ। ধোঁয়া। আগুন। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে জামাল-খাদিজা। 'তালি কি তাগো পাড়ায়ও মিলিটারি ঢুকিছে?' এক মুহূর্তও চিন্তা করার সুযোগ পায় না। উঠোনে তাকাতেই বুকের রক্ত জমে হিম। কালো বিরাট এক আলখেল্লা পরা ইমাম। সাথে মেম্বর। পেছনে বুটের ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ। জামালের মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী যেন মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে সমস্ত মগজ বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। বুকের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে চিৎকার দিয়ে ওঠে খাদিজা। ঝট্ করে জামাল খাদিজার মুখ চেপে ধরে। মরিচ ক্ষেতের ভেতর লুকিয়ে পড়ে। সামান্য চোখ জাগিয়ে আড়াল থেকে দেখে। কী যেন বলাবলি করছে ইমাম। দুদ্দাড় মিলিটারিরা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। তপ্ত কড়াইয়ে দেয়া জ্যান্ত কইমাছের মতো অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল খাদিজা। তার ছেলে, তার রমজান ঘরের ভেতর ঘুমায়। ছুটে যেতে চায়। জাপটে ধরে জামাল– টের পালি সব্বাইকে মারি ফেইলবো ওরা। রমজানরে কিচ্ছু কবি নানি। বাচ্চাগে মারি কী হবে? রমজানতো দুধের শিশু, মাসুম বাচ্চা; অরে মারবি নানি। তাগো কি কুনো দয়া-মায়া নাই? টু শব্দ করবি নে। তালি মরতি হবি।

মুখে বলে ঠিকই জামাল, কিন্তু তার ভেতরটা দাউ দাউ জ্বলে। কী করা উচিত– বুঝে উঠতে পারে না। মনকে প্রবোধ দেয় মনে মনে; আবার নিজেই ভাঙে প্রবোধ তীব্র আতঙ্কে। গোঙানির মতো অস্ফুট শব্দ বেরোয় খাদিজার কণ্ঠনালী চিরে– আমার রমজান, হায় আল্লাহ্!

কয়েক পলকের মধ্যেই ঘটে যায় ঘটনাটা। মিলিটারিরা বের হয়ে আসে ঘর থেকে। চোখে আশার আলো দেখতে পায় জামাল। ভাবে– হে আল্লাহ্, হে মাবুদ, মাসুম বাচ্চার উপর তালি মিলিটারিগে দয়া হলো? হাজার শোকর তোমারে। ঘর থেকে রেরিয়েই মিলিটারিরা কী যেন বলে ইমামকে। ইমাম তড়াক্ করে ঢুকে যায় বারান্দায়। রাগে হাঁসের বাক্সে মারে এক লাথি। দ্রাম্ করে এক শব্দ হয়। হাঁসগুলো ভয়ে প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ওঠে। ঝটিতি পকেট থেকে ম্যাচ বের করে, পিদিমের কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় ঘরে। তারপর নেমে আসে মরিচ ক্ষেতের পাশে; পথে, অন্য বাড়ির দিকে। বিশাল কালো আলখেল্লার পেছনে ধুপ্‌ধাপ্ ভারি বুটের শব্দ।

মরিচ গাছের ভেতর মাথা ডুবিয়ে ফেলে জামাল আর খাদিজা। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ঘরের খড়ের চালে আগুন। দিশেহারা জামাল। তিন মাসের রমজান ঘরের ভেতর শোয়া। ঘুমুচ্ছে। 'তবে কি এতক্ষণ সে যা ভেবেছিল তা নয়? বাচ্চা বলে দয়া বা করুণা করল না তারা। এমনই নিষ্ঠুর তারা? এরা কি মানুষ? নাকি পশু? হায় খোদা, কী নিষ্ঠুর তুমি?' জামালের বুকের ভেতর অসংখ্য পাড় ভাঙার সপাসপ্ শব্দ। ইমামের প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে জামালের বাড়ি। ভেতরে ঘুমন্ত রমজান। অথচ তারা বেরুতেও পারছে না মরিচ ক্ষেত থেকে। বেরুলেই দেখে ফেলবে তাদের। মরিচ ক্ষেতের পাশেই, পথে দাঁড়িয়ে জ্বলে ওঠা বাড়ির দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি করে উঠছে মিলিটারিরা। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে জামাল আর খাদিজা। বেরুলেই গুলী। গোটা বাড়ি যখন জ্বলে উঠছে, তখন তারা ফিরে হাঁটা শুরু করল ইমামের পেছন পেছন।

ডুকরে কেঁদে ওঠে খাদিজা। ছুটে যেতে চায় রমজানকে আনতে। টেনে ধরে জামাল। ওই আগুনের মধ্যে সে যেতে দেবে না খাদিজাকে। জামাল নিজেই যাবে। টেনে ধরে খাদিজা। জামালকে যেতে দেবে না সে। সে মা। সে যাবে রমজানকে আনতে ওই আগুনের ভেতর। উন্মাদের মতো ছুটে যায়। পেছন পেছন ছোটে জামাল। দরোজার আগুন ভেদ করে খাদিজা ঢুকে যায় ঘরের ভেতর। এক ঝটকায় ছোঁ মেরে রমজানকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসে আগুন থেকে বাইরে। দৌড়ে নেমে আসে বাড়ির নিচে। ছুটতে থাকে। পেছন পেছন জামাল। বনপোড়া হরিণের মতো তারা ছোটে আগুনের বিপরীতে। আগুন থেকে দূরে। আগুন যেন তার লেলিহান শিখায় চেটে নিতে চায় খাদিজা ও জামালকে।

পাকিস্তানি আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ ছুঁয়েছে ততক্ষণে। আগুনের লক্‌লকে জিহ্বা যেন পেছন থেকে তাড়া করছে ওদের। ছুটছে। আঁচ এসে লাগছে তাদের গায়। নিরাপদ দূরত্বে এসে ফিরে দাঁড়িয়েছে বাড়ির দিকে। রক্তিম আভায় ঝলসে উঠছে তাদের মুখ। যাক পুড়ে সব। তাদের রমজানতো বেঁচেছে! এতক্ষণ খেয়ালই হয় নি রমজানের কথা। প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়েছে আগুন থেকে। বুকে দু'হাতে জড়ানো রমজান। মুখের কাছে এনে দিশেহারা, আনন্দ বিহ্বল মা চুমু খায় ছেলের মুখে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে খাদিজা– 'আমার রমজান! আমার রমজান!!'

জামাল স্তম্ভিত। পাথর। তাকিয়ে দেখে– খাদিজার কোলে রমজান নয়; রমজানের কোলবালিশ।

লতিফ চাচা

– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়?

– পানির কল? পানির কল দিয়ে কী হবে?

– ভারি পিপাস লাগছে।

– কলের পানি খেতে পারবেন নাকি? তা কি ভালো? রাস্তার কল বলে কথা?

– সমস্যা নাই বাজান।

– আর এত রাতে এখানে এলেন কোত্থেকে আপনি?

– এই রাস্তায় নাইট-গার্ডের চাকরি করি।

– আগে তো দেখি নি কখনও? কতদিন হলো?

– মাসখানেক।

– বাড়ি কোথায়?

– নীলফামারি।

– আচ্ছা। আসুন আমাদের সাথে।

রাত বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরছি পঁচিশে-বৈশাখ অনুষ্ঠান শেষে। পাড়াটা তখন ঘুমিয়ে। জনহীন। শান্ত। দু'একটা কুকুর ছাড়া তেমন কোনো প্রাণী চোখে পড়ে না। দু'এক বাড়িতে আলো জ্বলছে। সাদা চুল সাদা দাড়ি সত্তরোর্ধ্ব লোকটার সাথে দেখা গলির ভেতর। গায়ে পুরনো পাঞ্জাবি। পরনে লুঙ্গি। হাতে বোতল। পানি খুঁজছেন। ভরাট কণ্ঠে আমার স্ত্রীকে বললেন– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়?

গমগমে আভিজাত্যপূর্ণ কণ্ঠ। মেঘমন্দ্র আওয়াজ। মায়াবী। উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকলেও বেশ শুদ্ধ। কথা বললে মনে হয় আবৃত্তি করছেন। কেমন মায়া হলো। বাসায় নিয়ে এলাম। ডাইনিং টেবিলে বসালাম। ফিল্টার থেকে এক গেলাশ জল ঢেলে দিল ঋতু। তারপরেই মনে হলো শুধু জল দেয়াটা ঠিক হলো না। 'একটু দাঁড়ান' বলে কৌটো থেকে বিস্কুট বের করে পিরিচে সাজিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল– রাতে খেয়েছেন?

– হ্যাঁ, খেয়েছি।

– কখন?

– সন্ধের টাইমে।

ঋতুর মনে হলো শুধু বিস্কুট দেয়াটা ঠিক হলো না। কোন্ সন্ধের সময় কী খেয়েছেন, এখন ক্ষিধে পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি পাউরুটি সেঁকে ডিম ভেজে দিল। খাওয়ার ফাঁকে কথা হচ্ছিল। বাড়ি নীলফামারি। স্ত্রী আর দুই মেয়ে। বাড়িতে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। লেখাপড়া বিশেষ একটা হয়ে ওঠে নি। স্বামীর বাড়ি থাকে। ছোট মেয়েটি ক্লাস নাইনে পড়ে। বাঁশঝাড় ছাড়া আয়ের আর কোনো উৎস নেই। সংসার চালানোই দায়। তার উপর মেয়ের লেখাপড়া। এলাকার একজন এখানে নাইটগার্ডের চাকরি করে। সে-ই তাকে নিয়ে এসেছে এখানে। কথায় কথায় ঋতু জিজ্ঞেস করল– এখনতো আমের সময়, আপনাদের এলাকায়তো প্রচুর আম হয়; কোনো আম খেয়েছেন এবার?

– না, মাও।

– সে কী? আপনাদের অঞ্চলে এত আম হয়, তা এবার কোনো আম খান নি আপনি?

– এখানে আমের খুব দাম মাও। গরিব মানুষ।

আমের দেশের মানুষের আম জোটে না। কথটা বুকে লাগল। সুকান্ত'র 'প্রিয়তমাসু' কবিতার সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি মনে এল 'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা/ যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে/ অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য/ নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার'। ঋতু উঠে ফ্রিজ থেকে দু'টো হিমসাগর আম বের করে কেটে দিল। লোকটার চোখে জল এসে গেল। আম মুখে দিতে দিতে চোখের জল সামলে নিলেন।

ঋতু জিজ্ঞেস করল– সন্ধের সময় কী খেয়েছেন?

– খেয়েছি মাও।

– কী খেয়েছেন?

– খেয়েছি।

যেন বলতে চাচ্ছিলেন না। লুকোচ্ছিলেন।

– কী খেয়েছেন তা বলছেন না কেন?

– রুটি আর তরকারি।

– ভাত খান নি রাতে?

– না মাও। রাতে রুটি তরকারি খাই। ভাতে খরচ বেশি পড়ে।

কথাটা এক দলা অসহায়ত্ব ছড়িয়ে দিল। ঋতুর কষ্ট হলো। আমারও।

– ভাত খান? মাছ আছে, মাংস রান্না করা আছে। গরম করে দেই?

ঋতুর দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। ঋতু রান্নাঘরে ঢুকে গেল। দশ মিনিটে খাবার টেবিলে প্রস্তুত। তৃপ্তি সহকারে খেলেন। খাওয়ার সময় খুব একটা কথা বলেন নি তিনি। চোখে যেন থমথম করছিল মেঘ। দেখে মনে হচ্ছিল এমন ভালো করে অনেকদিন খান নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম– থাকেন কোথায়?

– শিবু মার্কেট।

– ওখানে কেন?

– ভাড়া কম।

– কত?

– দুইশো টাকা।

– খান কোথায়?

– ওখানেই। খেতে লাগে বারোশো টাকা।

– বেতন পান কত?

– দুই হাজার।

– তাহলে বাড়ি পাঠান কী?

– ছয়শো টাকা।

– হাত খরচ? তারপর আসা-যাওয়া?

– শিবু মার্কেট থেকে বাসে আসতে এক টাকা, যেতে এক টাকা। আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি, আবার হাঁটতে হাঁটতেই চলে যাই। মাসে বাসভাড়া ষাট টাকা বাঁচে। তাছাড়া এটুকুমাত্র পথ। মাত্র দুই কিলোমিটার।

এ আর এমন কী? আর কোনো খরচ নাই আমার। পান-বিড়ি-সিগারেটের নেশা নাই। বুড়া মানুষ। তেমন কোনো শখ আহ্লাদ নাই। কোনোরকমে চলে যায় বাজান।

এরপর হাতের বোতলে ফিল্টার থেকে এক বোতল জল ভরে দিয়ে ঋতু বলল– চাচা, আপনার যখন ইচ্ছে হবে আমার বাসায় চলে আসবেন। যা খেতে ইচ্ছে হবে, বলবেন। লজ্জা করবেন না। আর প্রতিদিন এই ফিল্টার থেকে এক বোতল করে জল নিয়ে যাবেন। মনে করবেন আমিই আপনার মেয়ে। আপনার মেয়ে কাছে থাকলে সে তো এটুকু করত, তাই না? লতিফ চাচার চোখে চিকচিক জল। এরপর উঠলেন। বাজান আসি, মাও আসি বলে চলে গেলেন। কেমন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলাম মুহূর্তেই। তিনি চলে গেলেন। কিন্তু রয়ে গেল তাঁর ভরাট কণ্ঠের আওয়াজ। মায়াবী সম্বোধন– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়? সারা ঘরে শব্দটা যেন আঠার মতো লেগে রইল– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়? তিনি চলে গেলেন, কিন্তু মন জুড়ে রেখে গেলেন কী এক সম্মোহন। বুকের ভেতর কী এক কষ্ট এবং ভালো লাগা বোধ মিলেমিশে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকল একত্রে। মিশ্র একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল গোটা দেহ ও মনে। তাঁর সম্বোধনটা প্রতি মুহূর্তে প্রতিধ্বনি তুলে বেজে যাচ্ছিল বুকে। যেন কত যুগের আপন।

এরপর প্রতি রাতে একবার করে আসা চাই-ই তাঁর। না এলে কী যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায় দিনটায়। লতিফ চাচারও হয়ত ঋতুকে দেখার ছল করে মেয়েকে দেখে যাওয়া হয় একবার। মেয়ের হাতের এক কাপ চা খাওয়া হয়। অনেক গল্প হয় তাঁর সাথে। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। ভারতে ট্রেনিং নিয়েছেন। দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। এখন না খেয়ে মরতে হয়। লেখাপড়া তেমন হয় নি তাঁর। হাইস্কুল পর্যন্ত পড়েছিলেন। যুদ্ধের ডাক এলে যুদ্ধে যান। দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশে ফিরেছেন। এরপর সংসারের জোয়াল কাঁধে। বিয়ে। সন্তান। মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেন না। বেতন দিতে পারেন না। বই কিনে দিতে পারেন না। ভালো জামা দিতে পারেন না। স্ত্রীকে শাড়ি কিনে দিতে পারেন না। সংসারে নিত্য অভাব। স্বাধীন দেশের মুক্তিযোদ্ধা আজকের নাইট-গার্ড। এখনও তিনি যুদ্ধ করেন বাঁচার জন্যে। এখনও পাহারা দিয়ে যান দুর্বৃত্তদের।

রোজ রাতেই প্রায় আসেন তিনি। এ কথা সে কথা হয়। যুদ্ধের কথা, জীবনের কথা, মানুষের কথা। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অভাব আর সংগ্রামের কথা। কিন্তু মাস তিনেক পেরিয়ে গেলে এক রাতে বললেন– মালিক বেতন দেয় না। দেই-দিচ্ছি করছে। বেতন চাইলে ধমক দেয়। গালি-গালাজ করে। বাড়িতে টাকা পাঠানো দরকার। এখানে হোটেলে বাকি পড়েছে। মেয়ের স্কুলের বেতন দিতে পারছেন না। বই কিনতে পারছেন না। বৃদ্ধের চোখে সমস্যা ও সঙ্কট প্রকট। লজ্জায় এতদিন জানান নি। হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললাম– এটা আপাতত বাড়ি পাঠিয়ে দিন। আর আগামীকাল মেয়ের বই যোগাড় করে দেব। পরে পাঠিয়ে দেবেন। চিন্তা করবেন না। দেখি কী করা যায়।

মেয়ের জন্যে জামা-কাপড় আর কিছু বই পাঠিয়ে দিলাম। কিছুটা হলেও স্বস্তি। এভাবেই চলছিল। আরও মাসখানেক বাদে এক সন্ধ্যায় এসে কেঁদে ফেললেন– মাও, আমার চাকরিটা চলে গেছে। দুই মাসের বেতন বাকি। মালিক বলে– বুড়া মানুষ, বসে বসে ঝিমাও। ঠিকমতো পাহারা দিতে পারো না। তোমারে দিয়া চলবে না। আসলে কী জানো মাও, মালিকের ভাইস্তা পাশের বাড়ির গ্রিল ভেঙে টিভি চুরি করেছে। আমি দেখে ফেলেছিলাম। তারা আমাকে শাসালো– কাউকে বললে গলা টিপে মেরে ফেলবে। আমি এখন কোথায় যাব, কী করব মাও? তাঁর চোখের জল কষ্টের উদ্রেক করে। তিনি যেন আমাদের পরিবারেরই একজন। তাছাড়া একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাই আঘাতটা আমাদেরও লাগল। কিছু একটা করা দরকার।

সান্ত্বনা দিয়ে রাতের খাবার খেতে দেয়া হলো। পরদিন আসতে বলে মেসে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু ভেবে কোনো কূল পাচ্ছিলাম না কী করা যায় লোকটার জন্যে। হঠাৎ মাথায় এল আমলাপাড়া হাইস্কুলে দারোয়ান বা নাইট-গার্ড বা ওই জাতীয় কোনো কাজে তাকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে কিনা। হেডমাস্টার এবং স্কুল পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাদের বিশেষ পরিচিত। রাতেই যোগাযোগ করলে তাঁরা আশ্বাস দিলেন।

পরদিন লতিফ চাচা এলে হাতে কিছু টাকা দিয়ে স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেয়া হলো রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি তুলতে। আর্জেন্ট ছবি তুলে নিয়ে এলেন। নিজ হাতে দরখাস্ত কম্পোজ করে প্রিন্ট দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম স্কুলে। চাকরিটা হয়ে গেল। নাইট-গার্ড। মাসিক বেতন আপাতত তিন হাজার টাকা। মুখে এক গাল হাসি নিয়ে সন্ধের সময় এসে হাজির। একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখে বিজয়ের হাসি দেখে প্রাণটা ভরে গেল।

ভালোই চলছিল। বেতন ছাড়াও নানা কাজ থেকে অতিরিক্ত কিছু আয় হয়। স্কুলের নাইটগার্ডের তেমন কোনো কাজও নেই। মেইন গেট আটকানো হয়ে গেলে ঘুমিয়ে পড়লেও অসুবিধা নেই। চাকরিটা তাঁর যোগ্য। মেয়ের স্কুলের বেতন, বই, পোশাক, স্ত্রীর শাড়ি, হাতখরচ– নিয়মিত পাঠাতে পারেন। শরীর ও মনে শান্তির ছাপ। স্কুলেই একটা রুমে থাকার জায়গা হয়েছে। রাতে অবশ্য বারান্দায় শুয়ে বসেই কাটান। খান পাশেই এক হোটেলে মাসিক চুক্তিতে। আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার যেন শেষ নেই তাঁর। প্রতিদিন একবার বাসায় না এলে চলে না। দিন মাস বছর কেটে যায়। লতিফ চাচা আমাদের আপনজন হয়ে ওঠেন। সংসারেরই একজন সদস্য হয়ে ওঠেন। ভালো কোনো খাবার হলে তাকে ছাড়া যেন চলে না আমাদের। জন্মদিনে আমার মেয়ের জন্য কিনে নিয়ে এলেন লাল একটা ফ্রক। ছোট্ট আমার মেয়েটার খুশি দেখে কে? অন্য অনেক গিফ্‌টের চেয়ে ওটাই যেন তার কাছে বেশি প্রিয়। কারণ, ইতোমধ্যে লতিফ চাচার সঙ্গে তার মিষ্টি সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে।

বছর দুই/তিন হয়ে গেল। বেতনও তিন হাজার থেকে বেড়ে পাঁচ/ছয় হাজার টাকা। সবার প্রিয় লতিফ চাচা। সবার সাথে তাঁর সুসম্পর্ক। নাইট গার্ড হলেও সবাই তাঁকে সমীহ করে। একজন মুক্তিযোদ্ধা বলে তাঁকে সম্মান করে। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়দিবসের অনুষ্ঠানে স্কুলের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁকে সম্মাননাও দেয়া হয়। উত্তরীয় পরানো হলো। ক্রেস্ট দেয়া হলো। কিছু টাকাও দেয়া হলো। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় সে খবর ছাপাও হলো। এত সুখ তাঁর সত্তর বছরের জীবনকে কানায় কানায় ভরে দিল। কিন্তু এরই মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। কথা নেই বার্তা নেই লতিফ চাচা আসেন না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল চাকরিটা চলে গেছে। লজ্জায় কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেছেন নিরুদ্দেশে। হয়ত দেশের বাড়ি। তাঁর বিরুদ্ধে ল্যাবরেটরির মাইক্রোসকোপ চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে। কথাটা বিশ্বাস করতে পারি নি। অসম্ভব। লতিফ চাচার পক্ষে এ কাজ করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাঁকে কয়েক বছর ধরে দেখে আসছি। তাছাড়া তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি এ কাজ করতে পারেন না। কিন্তু লতিফ চাচার সাথে যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। তাঁর কোনো মোবাইল ফোন ছিল না। তাঁর বাড়ির ঠিকানাও জানা নেই। চুরির দায় মাথায় নিয়ে লতিফ চাচা চলে গেছেন হয়ত গ্রামের বাড়ি। নীলফামারি। দুঃখে কষ্টে অসম্ভব অভিমানে কাউকে কিছু না জানিয়ে লতিফ চাচা চলে গেছেন মেকি শহর ছেড়ে। আর দেখা হয় নি তাঁর সাথে। কোনো খোঁজও পাই নি আর। তবে একটিবারের জন্যেও আমি ভুল বুঝি নি তাঁকে। কখনওই মনে হয় নি লতিফ চাচা চোর। প্রথম দিনে শোনা লতিফ চাচার কণ্ঠস্বরটা বারবার কানে বাজতে থাকে– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়?

কয়েক মাস কেটে যাবার পর আমার ঠিকানায় একটা চিঠি এল। চিঠিটা লিখেছে তার ছোট মেয়ে সুনন্দা। সে এবার অনার্স ফাইনাল দেবে। সে জানে না তার বাবা চোর। কিংবা চুরির অপরাধে চাকরি হারিয়েছে। সে জানে তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা। কয়েকদিন হলো তার বাবা মারা গেছে। রাষ্ট্রীয় সম্মানে তাকে দাফন করা হয়েছে। বৃদ্ধা মা শুধু কাঁদে। আমার কাছে কিছুই চায় নি সে। কোনো ঠিকানাও দেয় নি। শুধু খবরটা জানানোর জন্যে চিঠি। ঋতু কেঁদে চোখ ভাসায়। আমার বুকের ভেতর গুমরে থাকা মেঘের অস্তিত্ব টের পাই। এক দলা কষ্ট জমে থাকে বুকে। লতিফ চাচা আমাদের শুধু আপনজনই নয়, একজন মুক্তিযোদ্ধা। সেই অহঙ্কারের জায়গাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। যদিও আমার বিশ্বাস হয় নি, হবেও না কোনোদিন যে লতিফ চাচা চোর। লতিফ চাচা নেই, কিন্তু প্রথম দিনে শোনা তাঁর কণ্ঠস্বরটা বারবার কানে বাজতে থাকে– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়?

মুক্তিযোদ্ধার গল্প এত তাড়াতাড়ি শেষ হয় না। পিরোজপুরের অমল সহকারী নাইট গার্ড। বয়স অল্প। লতিফ চাচার ছেলের বয়সি। সেই অধিকারে তাকে উপদেশ দিতেন। শাসন করতেন। নিজের ছেলে নেই। তাই অমলকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। কোথায় যেন সূক্ষ্ম বাৎসল্য প্রেম লুকিয়ে থাকত। স্কুলের গেট বন্ধ হবার পর চাবি থাকত অমলের কাছে। রাতের খাওয়া শেষে একটু পায়চারী করতেন, তারপর বারান্দায় মশারী টাঙিয়ে ঘুম দিতেন লতিফ চাচা। মাঝে মাঝে উঠে পুরো স্কুল চত্বরটা চক্কর দিয়ে আসতেন। রাত বাড়লে একদল বখাটে যুবক আসত আড্ডা দিতে। সাথে বোতল থাকত। মদ খেত। মেয়েমানুষও থাকত। বখশিসের বিনিময়ে অমল গেট খুলে দিত। লতিফ চাচা লক্ষ করেছেন ব্যাপারটা। কয়েকদিন অমলকে বকেওছেন। সে শোনে নি। ওদিকে বিকেলের শিফটের ইন চার্জ দিলরুবা ম্যাডাম স্কুল ছুটির পরও যান না। কাজের দোহাই দিয়ে বসে থাকেন। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলে বি.এসসি. টিচার অশোকবাবু আসেন স্কুলে। প্রতিদিন কী জরুরি কাজ থাকে তার। দরজা বন্ধ করে দিলরুবা আপার রুমে আড্ডা দেন রাত আটটা/ন'টা পর্যন্ত। লতিফ চাচার দৃষ্টি এড়ায় না এসব।

গোপন বিষয়গুলো আর গোপন থাকে না একসময়। এক কান দু'কান করে পাঁচ কান হয়ে যায়। স্বভাবতই দোষ লতিফ চাচার ঘাড়ে গড়ায়। অমল তো তুরুপের তাস। তাকে হাত করা টাকা দিয়ে। দিলরুবার দিলের দরজায় ধাক্কা লাগল। মদ্যপগুলোর স্বাভাবিক গতিতে বাধা পড়ল। ভিতরে ভিতরে তারা মহাজোট গঠন করল। লতিফ চাচা বৃদ্ধ, সন্ধে হলেই ঘুমায়, মিথ্যে কথা বলে– ইত্যাদি নানা অপবাদ দিয়ে হেডমাস্টার এবং চেয়ারম্যানের কান ভারি করা হলো। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে লতিফ চাচার কথা ধোপে টিকল না। তার উপর মাইক্রোসকোপ চুরির ঘটনা। ওটা লতিফ চাচারই কাজ। মেয়ের ফরম ফিলাপের টাকা যোগাড় করার জন্যেই এ কাণ্ড। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। মদ্যপগুলো তালা ভেঙে মাইক্রোসকোপ করল চুরি, আর দোষ চাপানো হলো লতিফ চাচার উপর। সাক্ষী শক্তিশালী, তাই চুরির অপবাদ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধার চাকরিচ্যুতি।

এ লজ্জা কোথায় রাখবেন? কাউকে কিছু না বলে তাই পরদিন সকালেই বাসে চেপে নীলফামারি। মনের কষ্ট মনে পুষে রাখলেন। এক প্রকার আত্মনির্বাসন। দুঃখে কষ্টে অপমানে স্বাধীন বাংলাদেশে আর বেশিদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় নি হয়ত লতিফ চাচার। তাই খুব বেশিদিন আর বাঁচেন নি। কিন্তু বাড়িতে তাঁর কেউ জানে নি এ ঘটনা। লতিফ চাচা কাউকে বলেন নি যে সে চোর।

আমি আর ঋতু ছাড়া আর কেউ জানে না লতিফ চাচার মৃত্যুর খবর। কী-ই বা হবে জেনে? একজন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে কোথাও কোনো প্রভাব পড়ে না সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে। তাঁর অবর্তমানে কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে যথারীতি চলছিল রাতের কীর্তি-কলাপ। প্রতিদিন সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে, রাতের কীর্তি থেকে যায় রাতেরই অন্ধকারে। এক সকালে স্কুলের মাঠে এক যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। ছড়িয়েছিটিয়ে বোতল ভাঙা গেলাশ প্যান্টি ব্রা ছেঁড়াস্যান্ডেল। অমল লাপাত্তা।

মিনার

এই হালার পুতেরা– বাইরঅ, শিগ্‌গির বাইরঅ ঘর থিক্যা; হক্কলেই বাইরঅ। কুনো চুদির পুতই ঘরের ভিতর হান্দ্যায়ে থাকপি না। বাইরঅ। বাপের জন্ম হইলি জলদি বাইরঅ।

চোলাই মেশানো ভুসি খাওয়া আবালের মতো ফাল পাড়ে আদর্শ ইন্সটিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল আলহাজ্ব আব্দুল কুদ্দুস শিকদার ফরিদপুরী। ফাল পাড়ে আর বুনো শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। দৃশ্যটা ভীতিপ্রদ হলেও মজার আর লোমহর্ষকও বটে। বেশ অভিনব, বেশ চমকপ্রদ। মাথায় সাদা টুপি, গালভর্তি মেহেন্দি লাগানো দাড়ি, পচা সুপারির মতো সুরমা লাগানো গোল গোল চোখ, আর জর্দা মেশানো পান খাওয়া দাঁতের কিড়মিড়ি– বাচ্চা বাচ্চা পোলা-মাইয়া গুলান ভয়ে একেবারে কেঁচো। কেঁচোগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে যায়, আর লুকোনোর জন্য গর্ত খোঁজে। কোমলমতি এইসব শিশুরা দাদা-দাদির কাছে কেয়ামতের যে বর্ণনা শুনেছে তাতে তারা ভাবতে শুরু করে– রোজ কেয়ামত হয়ত শুরু হয়ে গেছে। আজ বুঝি রোজ কেয়ামতের দিন। আব্দুল কুদ্দুসের ফালের ঠেলায় তার পরনের একমাত্র লুঙ্গিটা আছে, না খুলে গেছে– তা বুঝতে পারে না এই কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের সন্দেহ হলেও সন্দেহের নিরসন হয় না গায়ের পাঞ্জাবিটার জন্য। সেটা কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচলবিস্তৃত থাকায় অবশ্য লুঙ্গির গুরুত্বও তেমন আছে বলে মনে হয় না। কেয়ামতের আলামত পেয়ে শিশুশিশু ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই স্কুল ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকায়। চারদিক একই রকম আছে। বুক ভরে শ্বাস নেয়। বাতাসের গন্ধ একই আছে– সেই ধুলো-ধোঁয়া মেশানো ম্যান্দামারা গন্ধ। ভয় পেয়ে একটা কুকুর আব্দুল কুদ্দুসের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে দৌড়ে পালায়। শিশুরা আকাশে তাকায়। আকাশ আকাশের মতোই রয়েছে আকাশের জায়গায়। হাল্কা-পাৎলা কিছু কিছু মেঘ থাকলেও সেখানে কোনো কেয়ামতের আগুন কিংবা ইস্রাফিল কিংবা ইস্রাফিলের সিঙা কিংবা সেই সিঙার শব্দ– কিছুই দেখতে কিংবা শুনতে পায় না। দোজখের আগুন কিংবা কেয়ামতের আলামত কিছুই না দেখতে পেয়ে তারা হতাশ হয়।

আবার হুঙ্কার– এই হালিরা, তরা বাইরইছোস্ ক্যান? তগো বাইরইতে কইছি? কইছি হালার পুতেরা বাইরঅ। হালির পুতেরা বাইরঅ, কইছি? তাইলে খালি খালি বাইরইছোস্ ক্যান? মাইয়া পোলাপান যত্তো ছোডই অউক গিয়া– তা মাইয়া পোলাপানই। তরা জাহান্নামের রাস্তা। তরা খাড়াইয়া খাড়াইয়া মুতবার পারবি? ক, পারবি? তাইলে বাইরইছোস্ ক্যান? ঢোক, ভিতরে ঢোক। জলদি ঢোক। নইলে থাবা খাবি।

ভয়ে মেয়েগুলা নেকড়ের তাড়া খাওয়া ভেড়ার পালের মতো সুড়সুড় সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ে একটা রুমের মধ্যে। সাড়ে তিন লাফে সোজা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আব্দুল কুদ্দুস মূর্তিমান আজরাইল। বাইরে থেকে ঝট্ করে লোহার শেকল টেনে আটকে দেয় দরজা। ফার্মের মুরগির মতো চুপ মেরে যায় মেয়েগুলান। গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি-গাদাগাদি করে এক রুমের মধ্যে চুপসে থাকে সকল মেয়ে। কারো মুখে কোনো কথা সরে না ভয়ে। কোনো শব্দ হয় না। নিঃশ্বাস পতনের শব্দও না। ভয়ে বুকের রক্ত হিম। বরফের নীরবতা গলে চোখ বেয়ে ঝর্ণার জলধারার মতো নেমে আসে অশ্রু। তারপর আবার সাড়ে তিন লাফে নেমে আসে স্কুলের মাঠে। রণাঙ্গনে। যেখানে কোনো প্রতিপক্ষ নেই। রণ আছে, রণাঙ্গন আছে, প্রতিশোধ স্পৃহা আছে; প্রতিপক্ষ নেই। প্রতিপক্ষ শহিদমিনার। মৃত যোদ্ধার আত্মা।

'এল' প্যাটার্নের স্কুল ঘরের পুবদিকে কুয়াশায় রক্ত ছিটিয়ে সূর্য ওঠে। শহিদের রক্ত। সেই রক্তচ্ছটা এসে লাগে আব্দুল কুদ্দুসের মুখে, দাড়িতে, চোখে। চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করতে থাকে হায়েনার চোখের মতো। সে চেহারা ভয়ঙ্কর হিংস্র। পিশাচের মতো। দিনের বেলাতেও ভয় লাগে। তাকে দেখে যেন কিছুক্ষণ থমকে থাকে প্রকৃতি। সে যেন কারবালার এজিদ। প্রকৃতিও ভয় পায় তাকে। গাছের পাতা বিবর্ণ হয়, ফুলেরা শুকিয়ে যায়। সূর্যও চলে যায় মেঘের আড়ালে। প্রকৃতি থেকে বিদায় নেয় সমস্ত পেলবতা।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি শেষে মাসদাইর ডিগ্রি কলেজের ভি. পি. জয়নাল সংসদের কিছু ছাত্রনেতা এবং বেশ কিছু ছাত্র নিয়ে ছুটে আসে স্থানীয় আদর্শ ইন্সটিটিউটে। এ স্কুলে কখনও একুশে ফেব্রুয়ারি– শহিদদিবস পালন করা হয় না। পালন করা হয় না স্বাধীনতাদিবস কিংবা বিজয়দিবস। পহেলা বৈশাখ কিংবা পহেলা ফাল্গুন। রবীন্দ্র-জয়ন্তী কিংবা নজরুল-জয়ন্তী। পালন করা হয় না বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান কিংবা সাংস্কৃতিক সপ্তাহ। এখানে কখনও জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় না, জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। হয় মিলাদ মাহ্ফিল, বার্ষিক ওয়াজ। বড় জোর হামদ্ নাত ক্বেরাত প্রতিযোগিতা। এখানে কোনো বিধর্মী ছাত্র-ছাত্রী নেই। কোনো মহিলা শিক্ষক নেই। এ এক আজব স্কুল। বঙ্গোপসাগরের বিচ্ছিন্ন তালপট্টি দ্বীপের মতো বাংলাদেশে থেকেও যেন বাংলাদেশে নাই। সরকারি নিয়ম-নীতি বা রাজনৈতিক রক্তচক্ষু– কোনো কিছুর পরোয়া নেই। স্বশাসিত এ এক আজব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

ছাত্র-শিক্ষক লুঙ্গি বাধ্যতামূলক। নার্সারি থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত ছাত্র থাকলেও মেয়েরা এ্যালাউড নার্সারি থেকে ফাইভ পর্যন্ত। তা-ও বোরকা বাধ্যতামূলক মেয়েদের। মেয়েমানুষ হচ্ছে দোজখের দরজা। সেদিক থেকে আব্দুল কুদ্দুস মহা ভাগ্যবান। তার কোনো মেয়ে নাই। দুই স্ত্রী মিলিয়ে সন্তান সংখ্যা এগার। সবই ছেলে। এক একটা বংশের খুঁটি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে না জানিয়ে দ্বিতীয় কিস্তি বিয়ে করার ফলে ঝক্কিও কম সামলাতে হয় নি। প্রথম স্ত্রী খবরটা শুনে বেশ একটু তড়পা-তড়পি করেছিল। ধোপে টেকে নি। পানির মাছ ডাঙায় তুললে একটু তড়পায় কিছুক্ষণ, তারপর নিস্তেজ। শরিয়তি মারপ্যাচ তো কম জানা নেই। আব্দুল কুদ্দুস তার প্রথম বৌকে বলেছিল যে সে মাত্র দুইটা বিয়া করেছে, বেশি তড়পা-তড়পি করলে আরও দুইটা করবে। চারটা পর্যন্ত করার রাইট আছে। তাছাড়া গায়ে-গতরে যা তাতে চারটা স্ত্রী সামলানোর ক্ষমতা তার আছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে টাকা পয়সারও কমতি নাই। চারটা বউ পোষার মতো সামর্থ্য তার আছে। সাপের লেজে পা পড়লে সাপ ফোঁস করে ঠিকই, আবার মাথায় পড়া-পানি পড়লে মাথা নুইয়ে ফেলে। প্রথম স্ত্রী ভয়ে কাদা-জল। এরপর দুই স্ত্রী পাল্লা দিয়ে ছেলে জন্ম দিয়ে চলেছে। আর আব্দুল কুদ্দুসও বুদ্ধি খাটিয়ে প্রতি বছর এক একজনকে এক এক ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছে। নিজে আদর্শ ইন্সটিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বলে সব ক'টিই ফুল ফ্রি। সবচেয়ে বড়টি ক্লাস টেনে, আর সবচেয়ে ছোটটি নার্সারি। মাঝেরগুলা প্রত্যেক ক্লাসে এক একজন। পূর্ণ একটা ফুটবল টিম।

জোড়া বেত ছাড়া ক্লাসে যায় না আব্দুল কুদ্দুস। সে ক্লাসে ঢোকা মানেই রীতিমত বিভীষিকা। তার ছেলেরাও তাকে ভয় পায়। বাপকে দেখলে তারা বাপের নামই ভুলে যায়। প্রচণ্ড গরমেও ক্লাসে ঢুকেই ফ্যানগুলো বন্ধ করে দেবে। দু'পাশে দু'জনকে দাঁড় করাবে দু'টো পাখা হাতে। আস্তে কথা বলা তার অভ্যাস নয়। যখনই কথা বলে, চিৎকার করে বলে। মনে হয় ঝগড়া করে। হাঁক ছাড়ে– বাতাস কর। মৃদুমন্দ বাতাস চাই। জোরে বাতাস করলে বলবে– ঝড়ে উড়াইয়া দিবি নাকি? আস্তে করলে বলবে– আর এট্টু জোরে কর। ফ্যানের হাওয়া নয়, পাখার বাতাসই তার ভালো লাগে। তাছাড়া ফ্যানে শো শো শব্দ হয়। তাতে তার উপরের পাটির একটা ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায় উচ্চারণের যে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়, তা অরও বেড়ে যায়। কেউ পড়া না পারলে নাকে ঘরঘর শব্দ তুলে কফ এনে থুক্ করে ছিটিয়ে দেয় তার মুখে। নয়ত মুখের থুতু ছিটিয়ে দেয় নাকে-মুখে। কখনও কখনও কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে এক পায়ে খাড়া করে এক ঘণ্টা। তার প্রদত্ত অনেকগুলো শাস্তির মধ্যে অভিনব একটা শাস্তি হলো, মাঠে দাঁড় করিয়ে সূর্য-উপাসকের মতো সূর্যের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রাখা। ছাত্রদের সাধারণত ভোদড়, উদবিড়াল, উদবিড়ালের ছা, খাটাশ– এ জাতীয় সম্বোধন ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনে ভূষিত করে না।

শহিদমিনারে ফুল দেয়া পূজার শামিল, হিন্দুয়ানি বলে স্কুলের কেউ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে যায় না। স্কুলে সে প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, শহিদমিনারই নাই। সুখের বিষয় স্কুলে কোনো ফুল গাছও নাই। স্কুল হলো লেখাপড়ার জায়গা। গান-বাজনার জায়গা না। তা একদল কাফের গান-বাজনা শিখায়ে স্কুলগুলারে শিল্পকলা একাডেমি বানাইয়া ফেলছে। কোনো কোনো স্কুলে নাকি ড্যান্সও শিখায় শুনেছে। স্রেফ সিনেমা। হিন্দি সিনেমার ড্যান্স

অবশ্য লুকিয়ে চুরিয়ে মাঝে মধ্যে দেখে। মন্দ লাগে না। নাফাক, নাফাক। ওসব চলবে না এখানে। প্রিন্সিপ্যালের অনুপস্থিতিতে আজ আব্দুল কুদ্দুসই প্রিন্সিপ্যাল। তাই যে বনে খাটাশ রাজা, সে বনের মতোই অবস্থা এ স্কুলের। কচি কচি ছেলে-মেয়েগুলো যেন মুরগির বাচ্চা। খাটাশ তড়পাচ্ছে। ভি. পি. জয়নাল এ্যান্ড গং এর আগমনই এ তড়পানোর মৌলিক উপাদান।

জয়নাল একা আসে নি। সঙ্গী-সাথি নিয়েই এসেছে। 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর'। খালি হাতে আসে নি। এক বস্তা বালি, এক বস্তা সিমেন্ট; আর কয়েক বস্তা ইট নিয়ে হাজির। উদ্দেশ্য– নিজ হাতে একটা শহিদমিনার গড়ে দিয়ে যাবে। সিমেন্ট-বালি মিশিয়ে, ইটের ওপর ইট গেঁথে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তৈরি করে ফেলল একটা শহিদমিনার। দু'পাশের দু'টো ছোট, মাঝখানের একটা বড়– এই মোট তিন পিলারের শহিদমিনার। দেখলে মনে হবে– মাটি থেকে তিনটা আঙুলবিশিষ্ট একটা হাত বেরিয়ে এসে থেমে আছে। যেন আব্দুল কুদ্দুসকে থাবা দেবে। শাসাচ্ছে শহিদের হাত। দরোজা-জানালা বন্ধ অন্ধকার রুমের মধ্যে একা একা বসে আব্দুল কুদ্দুসের কেমন ভয় ভয়ই করতে লাগল। হঠাৎ কোথা থেকে এক আরশোলা উড়ে এসে আচমকা তার চ্যাপ্টা নাকের উপর পড়লে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। মৃত শহিদের আত্মা ভেবে ভয় পায়। আরশোলা তাড়িয়ে দিল। কিন্তু আঠালো কী একটা পদার্থ নাকে লেপ্টে থাকল। যথাযথ দূরত্ব ও সম্মান বজায় রেখে একটা ধাড়ি ইঁদুর সড়াৎ করে সরে পড়ল তার পায়ের কাছ দিয়ে। আঁৎকে উঠল। অল্পেই আঁৎকে ওঠে আজকাল। এসব আলামত ভালো ঠেকে না তার। অশুভ মনে হয়।

এই শহিদমিনারই আব্দুল কুদ্দুসের ক্রোধের উৎস। শালার কাফেরদের কাণ্ড। শহিদমিনার না বালের মিনার। রুমের মধ্যে বসে একা একা গজরায়। ছাত্রদের সামনে অবশ্য বের হবার সাহস পায় না পোঁদে লাথি খাওয়ার ভয়ে। যদিও তা লাথি মারার জন্য বেশ মানানসই। জয়নালকে সে বরাবর ভয় পায়। কোন্ সময় কী করে বসে, তার ঠিক নাই। পকেটে নাকি ওই জিনিসও থাকে সবসময়। বিশ্বাস কী, কোন্ সময় কপালে ঠেকায়ে দেবে। তারপর প্রথমে খট্টাস করে একটা শব্দ হবে। এরপর গুড়ুম। আব্দুল কুদ্দুসের কপাল চিচিং ফাঁক। ফুটো। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগবে ঘিলুতে। একবার এক থাপ্পরও খেয়েছিল সে। বাব্বা, কী রাম থাপ্পর! আড়াইশো কিলোমিটার বেগে এসে গালে পড়ল যেন সোয়া কেজি ওজনের বাটখারা। মনে পড়লে এখনও পিলে চমকে ওঠে। একাত্তর সালে মুক্তিরাও যা পরে নাই, ব্যাটা তাই করেছিল। গালভর্তি দাড়ি ছিল বলে রক্ষা। নয়ত চোয়ালটাই ভেঙে যেত মনে হয়।

শহিদমিনার গড়া হলে জয়নাল এবং তার সঙ্গীরা শহিদমিনারে ফুল দিয়ে গান ধরল– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' আব্দুল কুদ্দুস তখন তার রুমে কানে আঙুল দিয়ে বসে। যত্তোসব হিন্দুয়ানি কারবার! শালারা ছুঁচোর কেত্তন শুরু করছে। হারামির বাচ্চা অঙুলও বিশ্বাসঘাতকতা করে। যতই আঙুল চাপা দিক সুরটা কানের মধ্যে ঢুকে তীরের মতো খোঁচা মারে। নাউজবিল্লাহ্ ... নাউজবিল্লাহ্। কান থেকে আঙুল সরিয়ে দিয়ে একটু শোনে। মন্দ না। কাছে কেউ নেই। কানের আঙুল কিছুটা শিথিল করে শুনে নেয় একটু। স্বগতোক্তির মতো কণ্ঠ মেলায় গানের সাথে। মনটা বিগলিত হয়। গানটা শুনতে থাকে। নাউজবিল্লাহ্ ... নাউজবিল্লাহ্– এ সে কী করছে? আলতো করে নিজেই নিজের দুই গালে দুইটা চড় কষিয়ে দেয়। তওবা করে।

ইট-সিমেন্ট-বালির বস্তাসহ জয়নালদের স্কুলে ঢুকতে দেখেই ঝড়ের পূর্বাভাস টের পেয়েছিল আব্দুল কুদ্দুস। দ্রুত চলে গেছে নিরাপদ দূরত্বে। বিপদ এড়িয়ে চলাই ভালো। দরজা জানালা ফ্যান বন্ধ করে বসেছিল একা একা। তবুও মনের কোণে ছোট্ট একটা লোভ বুদ্বুদের মতো জেগে উঠে মিলিয়ে গিয়েছিল। দানা বাঁধতে পারে নি। ঝড়ের আকাশে মেঘের ফাঁকে একফালি রোদের হাসির মতো। তার একতলা বাড়ির এক পাশের বারান্দা এখনও ইন্‌কমপ্লিট। ঐ সিমেন্ট-বালির বস্তা হলে, আর ইটগুলা পেলে কাজটা শেষ করে ফেলা যেত। সব আশা কি পূর্ণ হয় মানুষের? তারও কত আশার মতো এ আশাটাও পূর্ণ হলো না।

মনে বড় আশা ছিল চারটা বিয়া করবে। মাত্র দু'টো হলো। তা করতেই হিমশিম। কত ছলা-কলার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এবার তো আবার দুই বউ। দুই বউ দুই মেরুতে বাস করে। কেউ কারো ছায়া মারায় না। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে একজনের সাথে একটু বেশি খাতির জমিয়ে অন্যের দুর্নাম করে। অন্যের বিরুদ্ধে লাগাতে চেষ্টা করে। লাগেও টক্কর। কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্নে তারা এক মেরুতে। যখনই সংলাপের ইস্যু হয়, তখনই তারা এক হয়ে যায়। বিরুদ্ধ আচরণ করে। তৃতীয় বিয়ের কথা উঠলেই তেলে-জলে এক। দুই বউ মিলে মহাজোট গঠন করে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা কঠিন। তবু আশা ছাড়ে নি। কথায় বলে– যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। টার্গেট চার বিয়ে। এবার আর মাঝ বয়েসি না। কাঁচা বয়সের। একা থাকলেই মনে মনে পাত্রী সন্ধান করে।

শহিদমিনার গড়া হলো, কাজ শেষ হলো– এ ধারণা নিয়েই জয়নালরা প্রস্থান করল। মনে করল তাদের দায়িত্ব শেষ। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের মতো মিছিল করে শ্লোগান দিতে দিতে জয়নাল ও তার দলবল বেরিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ তার রুমের দরজা বন্ধ করে তড়পাচ্ছিল আব্দুল কুদ্দুস। আর মাঝে মাঝে টিনের বেড়ার ফুটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল বাইরের কীর্তি। আর গজগজ করছিল রাগে। ভয়ে বেরুচ্ছিল না। ছাত্ররা চলে গেলে, বিপদের আশঙ্কা কেটে গেলে স্বমূর্তিতে বাইরে চলে আসে আব্দুল কুদ্দুস। এসেই লম্ফ-ঝম্প শুরু করে। যেন হনুমানের লেজে আগুন দিয়েছে কেউ। মেয়েগুলাকে ভেতরে ঢুকিয়ে সব ছেলেদের বের করে আনে রুম থেকে। আর শুরু করে হুঙ্কার।

ছেলেদের বড় থেকে ক্রমশ ছোটর দিকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয় শহিদমিনারের সামনে। স্কুলের ছোট্ট উঠোনে লাইনটা সাপের মতো একেবেঁকে যায়। সাপের লেজের দিকটা যেমন সরু, লাইনটারও শেষের দিকটা সরু। দূর থেকে দেখলে খোসাখোলা পাইথনের মতো লাগে লাইনটা। আব্দুল কুদ্দুস সামনে এসে লাইনের একেবারে সামনে দাঁড়ানো সবচেয়ে বড় ছেলেটার কাছে এসে হুঙ্কার ছাড়ে– 'এই মাগীর পুত, খোল'। ছেলেটা হকচকিয়ে যায়। বুঝতে পারে না কী খুলতে বলছে কুদ্দুস স্যার। বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। আবার হুঙ্কার– 'জলদি খোল'। ছেলেটা বুঝতে না পেরে বলে– 'স্যার, কী খুলব?' ছাত্রের এ অগাধ মূর্খতায় বিস্মিত হয় আব্দুল কুদ্দুস। বাংলা কথা বোঝে না! এতদিন কী শিখিয়েছে সে? কী শিখিয়েছে এই আদর্শ ইন্সটিটিউট? বৃথা চেষ্টা। পণ্ডশ্রম। বলে– 'চেন। বুঝিস না, প্যান্টের চেন'। ছেলেটা বুঝতে পারে না হঠাৎ প্যান্টের চেন খুলতে বলছেন কেন স্যার। তাছাড়া এই বয়সে, প্রখর প্রকাশ্য দিবালোকে, স্কুলে, এতগুলা ছাত্র-ছাত্রীর সামনে প্যান্টের চেন খোলার তাৎপর্য কী? এটা কি একাত্তর সাল নাকি? তার সামনে কি পাকিস্তানি আর্মি? সে ইতস্তত করছিল দেখে আবার হুঙ্কার। ছেলেটির মনে হচ্ছিল সে চিড়িয়াখানার ভেতর, সিংহের খাঁচার সামনে। সিংহটা গর্জন করছে। এবারে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করে ঝট করে সে তার প্যান্টের চেন খুলে ফেলে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে হুঙ্কার ওঠে–

– 'কর, পেচ্ছাব কর। বালের মিনার ভইর‍্যা পেচ্ছাব কর। পেচ্ছাবের পানিতে ভাসাইয়া দে। এক এক কইরা সব্বাই পেচ্ছাব করবি। কর।'

ছেলেটার কান ঝাঁঝাঁ করতে থাকে। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। সে তার বাবার নাম মনে করতে চেষ্টা করে। পারে না। কবরে শুয়ে থাকা পূর্বপুরুষের কথা স্মরণ করে। বুঝতে পারে না দোজখ, না স্বপ্ন। তেষ্টা পায়। গলা শুকিয়ে যায়। ভয় করতে থাকে। পেচ্ছাব আর হয় না। অনেক চেষ্টা করেও এক ফোঁটা পেচ্ছাবও বের হয় না। বমি আসে, পেচ্ছাব আসে না। ছেলেটা বলে ওঠে–

– স্যার, পেচ্ছাব আসে না। শরম করে।

– এই বেশরমের দল, শরম কীসের রে? শরম করে না পেচ্ছাব না করতে? এই হুজ্জত আলি, এই আক্কেল মিয়া খাড়াইয়া খাড়াইয়া কী করতাছেন? এইগুলান ধাড়ি পোলাপান, পেচ্ছাব করতে শরম পাচ্ছে। ছোড থেইক্যা বড়র দিকে লাইন করান। লাইন উল্টাইয়া ল্যাজের দিক সামনে দেন।

হুজ্জত আলি, আক্কেল মিয়া দুই অনুগত শিক্ষক দ্রুত দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে ওঠে। যেন কোনো মহৎ কর্মে নিয়োজিত দুই স্বেচ্ছাসেবক তারা। পুরো লাইনটা মুহূর্তের মধ্যে ঘুরিয়ে দিল। অজগরের লেজের দিকটা শহিদমিনারের সামনে আসে, আর মুখের দিকটা স্কুল ঘরের দিকে ঘুরে যায়, যেন এক্ষুণি হাঁ করে স্কুল ঘরটা গিলে খাবে দুর্দান্ত পাইথন। এবার যেন শহিদমিনার তাড়া করছে সাপটাকে। সবচেয়ে ছোট ছেলেটি শহিদমিনারের মুখোমুখি সবার সামনে দাঁড়ায়। মুরগির খাঁচায় আবদ্ধ মেয়েগুলা টিনের বেড়ার ফুটা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখে আর ভাবে, এর পর তাদের পালা। ছেলেগুলাকে তখন রুমের মধ্যে ঢুকিয়ে তাদের লাইনে দাঁড় করাবে পেচ্ছাব করাতে। এসব ভেবে তাদের কারো কারো দাঁতে কপাটি লেগে যায়। সবচেয়ে ছোট ছেলেটির প্যান্ট আছে কিন্তু প্যান্টে চেন নাই। তাই তাকে প্যান্ট খুলে ফেলার আদেশ দেয়া হলো। সে প্যান্ট খুলে দাঁড়িয়ে থাকল। ল্যাংটা পুটো। কিন্তু পেচ্ছাব করল না। আক্কেল মিয়ার আক্কেল আছে সত্যি। বসের আদেশের তোয়াক্কা না করেই সে আদেশ দিল–

– দে, দে ব্যাটা, পেচ্ছাব করে দে।

– স্যার, পেচ্ছাব হচ্ছে না।

– পেচ্ছাব হচ্ছে না মানে? ইয়ার্কি নাকি? আমার আদেশ। স্যারের আদেশ অমান্য করিস?

– স্যার, পেচ্ছাব আসে না।

– ক্যান পেচ্ছাব আসে না? মামাবাড়ির আবদার পাইছো? স্যারের সাথে বেয়াদপি? আলবৎ আসবে। পেচ্ছাবের বাপে আসবে। কর পেচ্ছাব। আমার হুকুম।

– স্যার, একটু আগেই পেচ্ছাব করছি। এখন আর পেচ্ছাব নাই।

– ক্যান, ক্যান একটু আগে পেচ্ছাব করলি? পারমিশন নিছিলি পেচ্ছাব করার? কার পারমিশনে তুই পেচ্ছাব করলি?

– ভুল হইছে স্যার। মাফ কইর‍্যা দ্যান।

লাইন থেকে আউট। নেক্সট। আক্কেল মিয়াকে ফ্লোর দিয়ে কিছুক্ষণ দম নেয় আব্দুল কুদ্দুস। চাউলের কল বন্ধ করার পরও কিছুক্ষণ যেমন হাপুস হাপুস শব্দ করতে থাকে, আব্দুল কুদ্দুসও তেমনি হাঁপাতে থাকে। মেদ-ভুড়ির কারণে অকারণে অল্পেই হাঁপিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় জনেরও পেচ্ছাব হয় না। হুঙ্কার–

– পেচ্ছাব কর শিগ্‌গির।

– স্যার, আগেই পেচ্ছাব হয়ে গেছে।

– মানে?

আক্কেল মিয়া অবাক হয়ে দেখে ছেলেটার প্যান্ট আগে থেকেই ভিজা। ভয়ে আগেই পেচ্ছাব করে দিয়েছে। অতএব নেক্সট। তৃতীয় জনেরও পেচ্ছাব হয় না। নেক্সট। তারও একই অবস্থা। এর পরের জন। তারও পেচ্ছাব হয় না। এক এক করে সবাইকে ডাকা হলো। কারো পেচ্ছাব হলো না। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে আব্দুল কুদ্দুসের মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। শালারা পেচ্ছাব করতেও শিখল না। সবাইর পেচ্ছাব শুকিয়ে মরুভূমি। হঠাৎ যেন কেমন নৈঃশব্দ নেমে এল এ প্রতিষ্ঠানে। মরা মেহগিনি গাছের ডালে বসা মুখর কাকটাও যেন কা কা ডাকা ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে মাঠের দিকে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কোথাও কোনো শব্দ নেই। আব্দুল কুদ্দুসও চুপ কয়েক মুহূর্তের জন্য। কবরের নীরবতা। এক ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ।

সেই নীরবতা ভেঙে হঠাৎ আব্দুল কুদ্দুস সামনে লাল কাপড় ওড়ানো ষাড়ের মতো লাফ দিয়ে ওঠে। ছুটে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তুমুল বেগে লাথি মারে শহিদমিনারের মাঝখানের পিলারের গায়ে। আর অমনি সাথে সাথে ধপাস। আল্লারে আম্মারে আব্বারে গেলামরে বলে গগনবিদারী চিৎকার। বুনো শুয়োরের বুকে বল্লম মারলে যেমন চ্যাঁচায়, তেমনি চিৎকার। হুজ্জত আলি আর আক্কেল মিয়া দ্রুত অকুস্থলে গিয়ে আব্দুল কুদ্দুসকে

উদ্ধার করে। কিন্তু আব্দুল কুদ্দুস পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। ব্যথায় কঁকায়। লুঙ্গি তুলে দেখে আঙুল ফুলে নয়, পা ফুলে কলাগাছ। গোদ রোগীর পায়ের মতো পাটা ঝুলে আছে। মিনার ভাঙে নি, ভেঙেছে আব্দুল কুদ্দুসের পা। দ্বারোয়ান দৌড়ায় রিক্সার খোঁজে। হাসপাতালে নেয়ার প্রস্তুতি চলে। যাবার সময় হুজ্জত আলি আর আক্কেল মিয়াকে তাকে ধরে দাঁড় করাতে বলে শহিদমিনারের সামনে। তারা বুঝতে পারে না আব্দুল কুদ্দুসের মতলব। তাই কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থেকে হুকুম তামিল করে।

হুজ্জত আলি আর আক্কেল মিয়া আব্দুল কুদ্দুসের দুই পাশে দুইজন দাঁড়িয়ে তাকে ধরে খাড়া করে দাঁড় করায়। তিন পিলার বিশিষ্ট শহিদমিনারের মুখোমুখি তিন জন দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ। যা কেউ ভাবতে পারে নি, আব্দুল কুদ্দুস হঠাৎ তাই করে বসল। সবার সামনে তার পরনের রুহিতপুরী প্লেকার্ড লুঙ্গিটা ঝট করে তুলে ফেলল উঁচু করে এবং হঠাৎ চড়চড় শব্দে শুরু করে দিল পেচ্ছাব করা। এ যেন বিনা মেঘে বৃষ্টিপাত। চক্ষের পলকে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে সিদ্ধান্ত নিতে ভুলে যায় চোখে পলক ফেলবে কি ফেলবে না। আর বিচার বিশ্লেষণ করার আগেই সম্পন্ন হয়ে যায় শহিদমিনারের শিশ্নস্নান। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল–

– দ্যাখ, ক্যামনে পেচ্ছাব করতে হয়। যত সব কাফেরের দল, কিচ্ছু শেখে না। শেখ, ভালো করে পেচ্ছাব করা শেখ। আমার ঠ্যাং ভাঙছে। তোরা ঐ মিনার ভাঙবি। ভেঙে গুঁড়া গুঁড়া করে দিবি। তারপর ইটগুলা আমার বাড়িতে দিয়া আসবি। আমি তাই দিয়া পেচ্ছাবখানা বানাব। সারাজীবন ওই ইট ভইরা আমি সুখে পেচ্ছাব করব।

হুজ্জত আলি আর আক্কেল মিয়া আব্দুল কুদ্দুসের দুই পাশে দুইজন দাঁড়ানো। তাকে ধরে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে শহিদমিনারের দিকে তাকিয়ে দুই সাগরেদ। কিছুক্ষণ স্থির থাকে। তিনজন এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে যে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাদেরকে তিন মিনারবিশিষ্ট একটা জ্যান্ত শহিদমিনার বলে মনে হয়। তারা যেন মৃত শহিদমিনারের প্রতিপক্ষ জীবন্ত শহিদমিনার।

রক্তের দাগ আজও যায় নি

শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর। একক পরিবেশনা। শিল্পী তিজন বাঈ। মধ্য-প্রদেশ। ভারত। অগণিত দর্শক-শ্রোতা। জ্বলছে মৃদু বাতি। সহসা তানপুরার হাহাকার। পর্দা সরলো। নমস্তেঃ। সমস্ত গুঞ্জন স্তব্ধ। কিছু কথার পর আলাপ। রাগ বেহাগ। চেতনা বিহ্বল। কোথায় এ সুর শুনেছি? কান প্রতারণা করছে। হঠাৎ মনে হচ্ছে– কোথাও দেখেছি। এবারে চোখও প্রতারণা করছে। রাগ বেহাগ। এমন হয় কেন? মনে হচ্ছে– এ স্বর, এ চেহারার সাথে কোথায় যেন বেহাগের ব্যথা লেগে আছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। এবারে বন্দেশ। অবশেষে সেই চির পরিচিত অথচ চির অচেনা খেয়াল– 'আব হো লালান ম্যায়কা, যুগ বিথগ্যয়ী তুমারে মিলনকো, তড়প তড়প জিয়ারা তরসে'। সমতল সুরের ঝর্ণাধারা। কোন এক প্রভাত রশ্মিতে উজ্জ্বল। মনে হয় দূর থেকে ভেসে আসা সুরের বুদ্বুদ। মনে পড়তে পড়তে হারিয়ে যায়। কোথায় যে শোনা, খুব চেনা। খুঁজে পাচ্ছি না। সুরের সুতো বেয়ে অজানা অতীতে চলি নিরুদ্দেশের পথে।

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেলাম। সহসা সুর মুদারা ছেড়ে তারায় চলে গেল– 'উমগ নৈন পর বজর কৈসে ঝর লাগে; জিয়ারা লরঝে, দাম নিশি কোঁধে মেহা বরসে'। মেঠো পথ ছেড়ে সুর হঠাৎ নেচে নেচে চলছে পাহাড়ি পথে। আর আমার মনও পেছন পেছন ছুটছে অনুসন্ধানে। রাগ বেহাগ। বহু চেনা অথচ অচেনা। বহু শতাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসা সুর। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে সুদূর কোনো অতীতে। অনেক অতীত এসে ভিড় করে স্মৃতির প্রান্তরে। সে অতীত খুঁজে পাই না কোনো হারানো মানিক।

কিন্তু কোথায়? এ সুর যেন শোনা নয়, দেখা; দেখা নয়, হৃদয়ের রক্তস্রোতে মেশা। তবে কোথায়? তবে কী পুরী? ভুবনেশ্বর? কোনারক? কান্তিনিকেতন? বেলুড় মঠ? বেনাপোল? ১৯৭১? আকাশ-পাতাল খুঁজেও পাওয়া গেল না। সব জায়গা খুঁজে ফিরে মন, ক্ষণেক বিশ্রাম করে নেয় সুরের বুদ্বুদে। আবার খোঁজে। 'খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর'। স্মৃতিতে যে গোধূলি। কী করে পাব? বেহাগের সুরস্রোতে চলছি ভেসে। চিন্তার সাগরে জেগেছে চর। কপালে ভাঁজ। ও ঠোঁটে মৃদু হাসি। চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু। এ কেমন? ঐ অশ্রুর সাথেও যেন কোথায় দেখা হয়েছিল। বড় চেনা চেনা। তবে কী অচেনাও কখনও কখনও চেনা হয়ে ওঠে? বেহাগের সুরে নেশার ঘোর লেগেছে বেদনার বালুচরে। সুর থামে না। ভেসে যায়। ভাসিয়ে নেয়। উত্তাল তরঙ্গে। সুরের জলসা ঘরে ভাসছি; শুধু একা আমি-ই। এখানে থেকেও নেই। ভেসে ভেসে দূর অতীতে।

ঘোর কাটল শ্রোতার করতালিতে। শেষ। শেষ হলো সুরের খেলা? কখন যে পার হয়ে গেল একটা ঘণ্টা, টেরই পাই নি। উঠে দাঁড়ালাম। মনের মধ্যে মনটা যেন কী খুঁজে ফিরছে? সুর! কিন্তু, মিলছে না। ছুঁই ছুঁই করেও ছুঁইছে না। আমি চলচ্ছক্তিরহিত। ঠায় দাঁড়িয়ে বিমূঢ়। বিস্ময়াভিভূত। কী যেন হারিয়েছি? কিংবা কী যেন ফিরে পেয়েছি? কিংবা পাই নি, পাওয়ার মতো মনে হচ্ছে। মাথার ভেতর কেমন এক নেশা। সুরের নেশা। হিসেব মিলছে না। বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। এমন কেন হচ্ছে?

মিলনায়তন জনশূন্য। আমি দাঁড়িয়েই থাকলাম। কী করতে হবে, খেয়াল ছিল না। আমি যেন আমিতে ছিলাম না। আমি সুরের খোঁজে ঘুরে বেরিয়েছি এক স্থান থেকে অন্য স্থান। এক দেশ থেকে অন্য দেশ। এক সময় থেকে অন্য সময়ে। মিলনায়তনে থেকেও যেন আমি ছিলাম না সেখানে। খেয়াল হলো। অবশেষে যখন বের হলাম, তখন দেখলাম তিজন বাঈ গাড়ির দিকে যাচ্ছেন। শিল্পীকে দেবো বলে রজনীগন্ধা এনেছিলাম এক গোছা। দিতে প্রায় ভুলেই গেছিলাম। লোকজনের ভিড় ঠেলে আমি গাড়ির দিকে এগোলাম। কী এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে গেল তিজন বাঈয়ের দিকে। গাড়ির কাছে চলে এলাম।

তিজন বাঈ গাড়িতে উঠলেন। দরজা বন্ধ হলো। গাড়ি গর্জন করে উঠল। রাস্তায় নেমে গেলাম। কিছু বলতে পারলাম না। হাতের রজনীগন্ধাগুচ্ছ গাড়ির জানালা দিয়ে তিজন বাঈয়ের দিকে এগিয়ে দিলাম। মৃদু হেসে রজনীগন্ধা নিতে নিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে গেলেন। চোখ কুঁচকে গেল। আমার

কপালের কাটা দাগটার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। এক পলক। চোখের কোণে মুক্তাবিন্দুর মতো অশ্রু টলটল করে উঠল। মনে হলো তাঁর চোখের জল আমার কাটা দাগে লেপ্টে আছে। ঠোঁট কাঁপছে। কিছু বলতে চাইলেন কি– কী করে ...? গাড়ি ছেড়ে দিল। কালো ধোঁয়ায় তিজন বাঈয়ের মুখটা ঝাপসা হয়ে গেল।

বুঝতে পারলাম না, আমার কপালের কাটা দাগের দিকে তিনি অমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন কেন? এ কাটা দাগের সাথে তাঁর কী সম্পর্ক? তবে কী তাঁর জীবনেও এমন কোনো কাটা দাগের ক্ষত লুকিয়ে আছে? কিংবা হতে পারে এ নিছক আমারই কল্পনা। কাটা দাগে হাত রাখলাম। মনে হচ্ছে ভিজে। চোখের সামনে হাত এনে দেখতে চেষ্টা করলাম। রাস্তার নিয়নবাতির আলোয় দেখা গেল না। রক্তের আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি। উষ্ণ রক্ত। ১৯৭১ সাল থেকে ভেসে আসা গন্ধ। রক্তের গন্ধ এমনিই হয়। মিলিয়ে যায় না; মুছে যায় না। যে স্মৃতি ভুলেই ছিলাম এতদিন, সে স্মৃতি এসে হুড়মুড় করে আমার মগজ খামচে ধরল। একেবারে দুমড়ে মুচড়ে দিল আমাকে। এ কাটা দাগটার সাথে আমার জীবনের একটা দুঃস্বপ্ন জড়িয়ে। আজ সে দুঃস্বপ্ন চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর আমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো শৈশবের এক দুঃসহ ভাঙনের মুখে।

১৯৭১। আমি তখন ছোট। পাঁচ কি ছয় বছর। দেশে যুদ্ধ। পশ্চিমা পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার। চারিদিকে গোলাগুলির শব্দ। আগুনের হল্কা। বিমানের অশনি সঙ্কেত। আমাদের গ্রামে তখনও শত্রুরা ঢোকে নি। বাবা হাটে গেছেন। দাদা যুদ্ধে; আর ফেরে নি। বাড়িতে মা আর দিদির সাথে আমি। দিদির ভালো গানের গলা। আমাকে প্রায়ই গান শোনায়ে ঘুম পাড়াত। কলেজে পড়ত। সেখানে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখত। অনির্দিষ্টকালের বন্ধ হওয়ায়, বাড়ি চলে এসেছে। এখানেও আতঙ্ক। হানাদার বাহিনী গ্রামেও ঢুকে পড়েছে। বাড়ি বাড়ি আগুন জ্বালছে। আর স্থানীয় লুটেরা বাহিনী চালাচ্ছে লুট। ধরে নিয়ে যাচ্ছে যুবতী মেয়েদের। ঐ দিনই আমাদের গ্রামে পাক হানাদাররা ঢোকে প্রথম। দেখতে দেখতে পাশের কয়েকটা বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠল। দিদি আমাকে কোলে তুলে মাকে নিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল বাড়ির পাশের পাটক্ষেতে। হানাদার বাহিনীর নজর এড়াল না। দৌড়ে এসে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। দিদিকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকালাম। মা কাকুতি মিনতি করতে লাগল। দিদি থরথর করে কাঁপছে। তার চোখে ভয়ের চাউনি। হানাদারদের হায়েনার চাউনি। ঝট করে আমাকে দিদির কোল থেকে টান মেরে ফেলে দিল ছুঁড়ে। আবার জড়িয়ে ধরতে গেলে বন্দুকের আঘাত করল। কপালের ডান দিক কেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। চিৎকার করে উঠলাম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। দিদি আমাকে কোলে তুলে নিতে যাচ্ছিল। তারা দিদিকে খপ করে জাপটে ধরল। আমি ভয়ে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলাম। শুধু শুনতে পেলাম দিদির আর্তনাদ; মায়ের কাকুতি-মিনতি।

তারা চলে গেলে চোখ তুলে দেখলাম পাশে পড়ে আছে দিদির বিবস্ত্র রক্তাক্ত শরীর। কতটুকুইবা বুঝি তখন? কিন্তু ভয় বুঝি। ভয় তখনও ছাড়ে নি আমাকে। দিদিকে মেরে ফেলেছে? কপালের ব্যথা ভুলে গেলাম। দিদির বুকে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার কপালের রক্ত দিদির বুকের রক্ত, মায়ের চোখের জল মিশে নখের থাবা ডুবিয়ে দিল। মা আমাকে সরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দিদির গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিতে দিতে বলল– 'এ কী করে গেল? এর চেয়ে মেরে ফেলাই ভালো ছিল'। তখনও ভয়– আবার হয়ত ওরা আসবে।

কিছুক্ষণ বাদে। চোখের সামনে দাউ দাউ জ্বলে উঠল আমাদের গোটা বাড়িটা। এত কিছু করেও ওরা তৃপ্ত নয়। ওদের হিংস্রতার লেলিহান শিখা আগুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওদের রক্ত চাই, আগুন চাই, আর চাই বাঙালি নারী। আগুনের কী উত্তাপ? তাকাতে পারছিলাম না। হল্কায় চোখ পুড়ে যেতে চায়। পাটক্ষেত দুলছিল আগুনের হল্কায়। কচিকচি পাতাগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। মনে হলো দিদি একটু নড়ে উঠল। বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। ভাবলাম দিদির গুলি লেগেছে, নইলে অত রক্ত কেন? মরে নি। কিন্তু আশ্চর্য! গুলির দাগ দেখলাম না কোথাও। তবে এত রক্ত এল কোত্থেকে?

দিদি কেমন যেন আধবোঁজা চোখে একবার তাকিয়েই চোখ বুঁজল। আমি কী করব বা কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু কান্না থামাতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম– বড় কোনো একটা সর্বনাশ

হয়ে গেছে। মা কুয়ো থেকে জল তুলে এনে দিদির মাথায় দিতে লাগল। অনেক পরে দিদির জ্ঞান ফিরল। কিন্তু, সেই থেকে সারাদিন শুধু কাঁদে। কোনো কথা বলে না। খায় না। আর মাঝে মাঝে জ্ঞান হারায়। সেদিন ক্ষিধে ভুলেছিলাম। আতঙ্ক আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরেছিল।

বাবা বাড়ি ফিরলেন বাজার নিয়ে। তখন সন্ধে। আমাদের কাছে এসে ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লেন। বললেন– 'এ কী হলো? বাড়িটা জ্বেলে দিল?' দিদি কেঁদেই চলেছে। মা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল– 'বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। পশুরা আমার লক্ষ্মী মাকে লুটে খেয়ে গেছে।'

বাবার দু'চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। পর মুহূর্তেই হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠলেন অসহায়ের মতো। তার সারা শরীর কাঁপছে। দিদির কাছে ছুটে গেলেন। দিদিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। মা-ও কাঁদছে। কিছু না বুঝেই আমিও তাদের সাথে কাঁদছি। তখনও বাতাসে ঘরপোড়া গন্ধ। তখনও পোড়া ঘরের আগুন গন্‌গন্ করছে। লাল টক্‌টক্। আমার কপালের রক্তের মতো। দিদির গায়ের রক্তের মতো।

রাত ভোর না হতেই আমাদের নিয়ে বাবা ভারতের পথে পা বাড়ালেন। বাবার ক্ষোভ– 'এ দেশে আর মানুষ থাকে?' ভোর হলে দেখলাম দিদির হাত ধরে চলেছে মা। আমি বাবার কাঁধে। সম্বল– হাট থেকে বাবার আনা সওদা। দু'দিন চলার পর জীবনের আরেক অধ্যায় শুরু। অদূরেই বেনাপোল। বর্ডার। পার হলেই ভারত। বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিলাম একটা বাগানের ভেতর। সেখানেও আমাদের মতো হাজার হাজার লোক। তখন রাত গভীর। ভোর হতে না হতেই ছেড়ে যেতে হবে। দিনে মিলিটারির উপদ্রব। কিন্তু রওনা দেবার সময় দিদিকে আর পাওয়া গেল না।

আশ্চর্য! দিদি কোথায় গেল? এ ক'দিন সে শুধু কেঁদেছে। একটা কথাও বলে নি। একটা গানও গায় নি। আমারও ভালো ঘুম হয় নি। দিদিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তবুও যাবার জন্যে বাবা আমাকে কাঁধে তুললেন। আমি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম। কাঁদতে লাগলাম– 'দিদিকে ফেলে আমি যাব না।' মা-ও কাঁদতে লাগল। শুধু বাবাকে বলতে শুনলাম– 'পাগলি পালিয়েছে। ও আর ফিরে আসবে না।'

চেয়ে দেখলাম– বাবার দু'চোখের জলের ধারা শুকিয়ে হয়ে গেছে দু'টি মরা নদী।

ভারত গেলাম। উড়িষ্যা থেকে বিহার, বিহার থেকে দেরাদুন; দেরাদুন থেকে মধ্যপ্রদেশ। কত জায়গায় ঠেলা খেয়ে গেলাম; কত শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিলাম। দিদির মতো কাউকে দেখলে কাছে গিয়ে লুকিয়ে তাকাতাম। সে নয়। একা একা কাঁদতাম। দিদি খুব আমসত্ত্ব পছন্দ করত। লুকিয়ে লুকিয়ে আরও কত কী কিনে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রেখে দিতাম। সান্ত্বনা, দিদির জন্যে এটুকু রাখলাম।

তারপর একদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। দেশে ফিরলাম। দিদির কথা ভুলেছি। দাদার কথা ভুলেছি। ঘরের কথা ভুলেছি। রক্তের কথা ভুলেছি। তবুও ছাই চাপা আগুনের মতো হঠাৎ কখনও দপ্ করে জ্বলে ওঠে স্মৃতি। বাতাসে ঘরপোড়া গন্ধ পাওয়া যায়। রক্তের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়। ভেসে ওঠে বিবস্ত্রা দিদির জীবন্ড় লাশ। স্বপ্নের ভেতর শোনা যায় দিদির চিৎকার। মায়ের আর্তনাদ। আর হানাদার বাহিনীর উল্লাস।

কিন্তু হঠাৎ এ কী হলো? সুর কোন্ খাদে বইছে? আজকের তিজন বাঈয়ের সুরটা যেন সেদিনের হারানো সুর। আর উনিইবা অমন করে আমার কাটা বপালের দিকে তাকাবেন কেন? তার চোখেইবা অশ্রু নামবে কেন? এ দাগের সাথে ও অশ্রুর কী সম্পর্ক? তবে কী ...?

হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দ হলো। দেখলাম আমি রাস্তার উপর কাৎ হয়ে পড়ে গেছি। গাড়ির ভেতর থেকে একজন মস্ত লোক বলে উঠলেন– 'এই উল্লুক, দ্যাখছো না, গাড়ি আইতাছে? রাস্তার মধ্যিখানে খাড়াইয়া আছো? কী দ্যাখছো, সার্কাস? যত্তোসব ...?

উঠে দাঁড়ালাম। কপালটা ব্যথা করছে। হাত দিতেই শিউরে উঠলাম। রক্ত! রক্তের গন্ধ নাকে আসছে। তবে কী সে রক্ত এখনও লেগে আছে। সে গন্ধ আজও যায় নি?

নিলামবালা

এক

মাথার ওপর গনগনে চুল্লি। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। হনহন সবুজ। ছুটছে। গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আশরাফুল আলম সবুজের। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না– কান্না না ঘামের জল। কপালে, চিবুকে, চোখের নিচে জলের ধারা। যা গরম পড়েছে, ঘামের জল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হবে সে কাঁদছে। যে কেউ দেখেই তাই মনে করবে। কিন্তু রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে কি কেউ কাঁদে? হতে পারে ক্লান্তি আর অবসন্নতায় ঘামের জলটাকেই চোখের জল বলে মনে হচ্ছে। আবার দু'টোই লোনা জলের ধারা। জ্যৈষ্ঠের পিচঢালা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পুরো ভিজে গেছে সবুজ। মনে হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। কারণ, প্যান্ট শুকনো, জামাটা ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। অনেক দিনের পুরনো। পাৎলা হয়ে গেছে। ভেতরের গেঞ্জিটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। বাইরে থেকে দেখা যায়। জামাটা শুকনো থাকলে অবশ্য ছেঁড়াগুলো বোঝা যায় না। একটাই জামা, একটাই প্যান্ট। নোংরা হলে রাতে কেচে দেয়। সকালে শুকিয়ে যায়। তারপর ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দেয় কিছুক্ষণ। ইস্ত্রি করা শার্টের মতো ভাঁজ হয়ে যায়। আলাদা করে ইস্ত্রি করা লাগে না। তবে যেদিন ইন্টারভিউ থাকে, সেদিন গলির মোড়ের 'পরিপাটি ধোলাই' লন্ড্রি থেকে ইস্ত্রি করিয়ে আনে। সেখানেও খরচ বেড়েছে। আগে একটা শার্ট বা প্যান্ট দেড় টাকা নিত। এখন দু'টাকা করেছে। আবশ্য ইস্ত্রি করলেও তার দু'টাকাই জলে যায়।

সে তো ফুলবাবু হয়ে রিক্সা কিংবা গাড়িতে ইন্টারভিউ দিতে যায় না। এমন কি বাসেও না। হেঁটে হেঁটেই যায়। কতইবা বড় ঢাকা শহর? তিন-চার ঘণ্টায় এ-মাথা থেকে ও-মাথা হেঁটে যাওয়া যায়। তাছাড়া হাঁটলে ব্যায়ামও হয়, শরীর মজবুত থাকে। পয়সাও বাঁচে। আর ইন্টারভিউ দিতে বেশিদূর হাঁটাও লাগে না। সে থাকে লালবাগের ওদিকটায়। জগন্নাথ সাহা রোড। গুলশান, বনানী অবশ্য এড়িয়ে যায় সবুজ। কারণ, তার মনে হয় ওসব জায়গায় তার চাকরি হবে না। তার থাকার জায়গা থেকে ইন্টারভিউ দিতে যেতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগে নি তার কোনোদিন। কী আর এমন পথ? গ্রামে থাকতে এর চেয়ে বেশি হাঁটতে হতো প্রতিদিন। তাই সে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে জামাটা ভিজে যায়। হয় বৃষ্টিতে, নয় রোদে ঘেমে। ভিজবেই। শীতকালে ভেজার সমস্যাটা কম। নইলে তার জামা প্রায়ই ভেজা থাকে। তাই ইস্ত্রি করলে দু'টো টাকাই জলে যায়। জলে যায় মানে ঘামের জলে যায়। কতবার ভেবেছে আগামী মাসে একটা জামা কিনেই ফেলবে। শহরের ফুটপাতে কত জামা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবুজ বেচাকেনা দেখেছে। ৮০/৯০ টাকায় জামা হয়ে যায়। ১০০ বা ১১০/১২০ টাকায় বেশ শক্ত, মোটা আর মজবুত জামা পাওয়া যায়। একটা কিনবে আগামী মাসে অবশ্যই। সে মাসেও কোনো একটা ফ্যাকড়া বাধেই। হয় চাকরির দরখাস্ত, নয় বাড়ি থেকে বোনের চিঠি– 'মায়ের ওষুধ লাগবে। কাশিটা বাড়ছে' কিংবা 'স্কুলের বেতন বাকি পড়েছে, জামা ছিঁড়ে গেছে' আরও কত কী! চাকরির দরখাস্ত মানে ১০০ টাকার ব্যঙ্ক ড্রাফট বা পে-অর্ডার। তা-ও যদি একটা চাকরি হতো। চাকরি দেয়ার নামে ব্যাটারা ব্যবসা ফেঁদেছে। প্রতি মাসেই দু'একটা ইন্টারভিউ থাকে। আর বেরিয়ে যায় দু'একশো টাকা। জামাটা আর কেনা হয় না।

জ্যৈষ্ঠের পিচঢালা রাস্তায় চলছে সবুজ। রাস্তার পিচ গলে গলে চটির তলিতে আটকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সামনের রাস্তা তাকে এগুতে দিচ্ছে না। এক সময় সে আবিষ্কার করে, তার চটির তলি নয়; পায়ের নিচে সুড়সুড়ি দিচ্ছে রাস্তার গলিত পিচ। পা-টা তুলে এক ফাঁকে দেখে নেয়; তার পায়ের নিচে সাদা অংশে কালো পিচের ছোপ। বাটিকের কাজ করা পাঞ্জাবির মতো। তাকিয়ে দেখে চটির ডান পাটির তলি ক্ষয়ে পোড়া তন্দুরি রুটির মতো ফাঁকা হয়ে গেছে। চটির ক্ষয়ে যাওয়া ফাঁকা দিয়ে রাস্তার কালো পিচ দেখা যায়। আবার মুচিকে বাইশ টাকা দিতে হবে। চটিটা যে কত আগের কেনা, তা মনে করতে পারে না সবুজ। মনে হয় বরফ যুগে ডাইনোসরের বিলুপ্তির সময় কেনা। কতবার যে তলি পাল্টিয়েছে, তার ঠিক নেই। উপরের অংশও কয়েকবার পাল্টিয়েছে। তবে খুব বেশি নয়। দুই কি তিনবার। অবশ্য মূল চটির আর কিছুই বিদ্যমান নেই এখন।

পাল্টাতে পাল্টাতে এ জোড়া অন্য চটি হয়ে গেছে। আসল চটিজোড়ার রঙটা কী ছিল মনে করতে পারে না সবুজ। ডিজাইনটাও মনে নেই। চাকরি পেলে একজোড়া নতুন চটি সে কিনবে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়। চাকরিটা হয়ে যেতে পারে। লিখিত পরীক্ষায় ভালোই করেছে। ভাইভাতেও মোটামুটি ভালোই উত্তর দিয়েছে। নামি কোম্পানি। হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আজকে রেজাল্ট দেয়ার কথা। বলেছে চিঠি দেবে না। বোর্ডে রেজাল্ট টাঙিয়ে দেবে। সে উদ্দেশ্যেই যাত্রা। শালার মাঝখানে স্যান্ডেল হয়ে গেল পোড়া তন্দুরি রুটি। তন্দুরি রুটির কথা মনে হতেই ক্ষিধেটা চাগিয়ে উঠল। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। আকাশের দিকে তাকাল। হাতে ঘড়ি নেই। ভাবল সূর্য দেখে আন্দাজ করে নেবে ক'টা বাজতে পারে। তা আর হলো না। শালার সূর্যটাও এমন রাগী চোখে তাকাল যে সে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য। দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেছে হয়ত। কিন্তু বাইরে তো খাওয়া যাবে না। পকেটে মাত্র দশ টাকা আছে। মাস শেষ। অবশ্য চাকরিটা হয়ে গেলে এক তারিখে জয়েনিং। টিউশনির টাকা তো পাবেই দু'একদিনের মধ্যে। বাসায় আলু, মরিচ, লবণ আছে। গলির মোড়ের মুদি দোকান থেকে আধা কেজি চাল কিনে আলু ভাতে খেয়ে নেবে। রাতেও তাতেই হয়ে যাবে। আধা কেজি চাল আট টাকা নেবে। আরও দু'টাকা পকেটে থেকে যাবে। দশ টাকার কথা মনে হতেই পকেটে হাত দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেয় নোটটার অস্তিত্ব। ঘামে ভিজে নোটটা বাসি পাপড়ের মতো নেতিয়ে গেছে। একসময়ে কড়কড়ে ছিল।

গ্রামের ছেলে গ্রামের কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে ঢাকায় এসেছে চাকরির খোঁজে। বাপ নেই। ছিল। বাবা এখন অতীত। যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা। ছিল। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে চিকিৎসার অভাবে মারা যান। বাড়িতে বৃদ্ধ মা রোগগ্রস্ত। বোনটা ক্লাস নাইনে। ভাইটা প্রাইমারি। থাকে জগন্নাথ সাহা রোডের নিচতলার একটা মেসে। ভাড়া। স্যাঁতসেতে একটা রুম। সিঁড়ির পাশেই। দিনের বেলায়ও বোঝা যায় না রাত না দিন। টিকটিকি, আরশোলা আর মাকড়সা সাথি। ইঁদুর আর ছুঁচো আসে মাঝেমধ্যে অতিথি হিসেবে। এক রুমে চারজন ব্যাচেলর বেকার ভাড়া থাকে। এক রুম। দু'চৌকি। চার মানুষ। আট চটি। কসিরুদ্দিন স্বল্প বেতনের কর্মচারী। ছোট মেয়েকে সবুজ পড়ায়। বড় মেয়ে আয়েশা বার দুই উচ্চ মাধ্যমিক ফেল দিয়ে এখন সবুজের পড়ানোর সময় চারপাশে ঘুরঘুর করে। টের পেয়েও কিছু বলে না কসিরুদ্দিনের বউ। কারণ, সবুজ এত চাকরির ইন্টারভিউ দেয়; একটা না একটা লেগে যাবেই। তখন আর আটকাবে না। আয়েশা তাই ঘুরঘুর করে, গুণগুণ করে; সবুজের চোখে চোখ পড়লে মুচকি একটু হাসে বাংলা ছবির নায়িকার ঢঙে। ক্লাস থ্রির আর একটা টিউশনি অবশ্য আছে সবুজের। দু'টো মিলে সাত+ছয়, তেরোশো টাকা আয়। তাই দিয়ে চলে যায় কোনোমতে। এর বেশি লাগে না মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের। স্বপাকে আলুসেদ্ধ আর ভাত। টিউশনি বাসায় অবশ্য চা আর নোনতা বিস্কুট কিংবা টোস্টে বিকেলের নাশতা। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত আর সমস্যা হয় না। কিন্তু জিওলের আঠার মতো হতাশার যন্ত্রণা সারক্ষণ লেগে থাকে মনে।

অফিস শুরু হলেই শুরু হয় অফিস টু অফিস ডিউটি। চাকরি করতে নয়, চাকরি খুঁজতে। পত্রিকার পাতা থেকে কাটা বিজ্ঞাপনের টুকরো, দরখাস্ত, সার্টিফিকেট ইত্যাদি কাগজপত্রসহ একটা কোর্ট ফাইল বগলদাবা করে চলে তার শহর পরিভ্রমণ। রাতটা ভালো ঘুমুনোর জন্য দুপুরটা সে ঘুমোয় না। বিকেল তিন-সাড়ে তিনটায় বেরিয়ে পড়ে। পাশাপাশি দু'টো পড়ানো শেষ করেই সোহ্‌রাওয়ার্দি পার্ক। ড. আহমদ শরীফের মজলিস। ওটা তার বিকেলের নাশতা। বিনে পয়সায়। সে খুব মজা পায়। সারদিনের সমস্ত গ্লানি এখানে এসে ধুয়ে মুছে যায়। কী চমৎকার সব জীবনঘনিষ্ঠ কথা তিনি বলেন। শুনলে জীবনের মরা গাঙেও যেন স্রোত বয়। তাই রোজ তার এ আসরে আসা চাই-ই। এটা তার নৈমিত্তিক ব্যাপার। সান্ধ্যকালীন আড্ডা।

এরপর আড্ডা ভেঙে গেলে ক্রমশ জনশূন্য হতে থাকে সোহ্‌রাওয়ার্দি পার্ক। এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে গণ ও গণিকার আনাগোনা। সে থেকে যায় আরও কিছুক্ষণ। জীবনটাকে কাছ থেকে দেখে। দেখে তার কদর্য রূপ, বীভৎস চেহারা। পার্কের আলো আঁধারিতে রিক্সাওয়ালা থেকে গাড়িওয়ালা সবাই সমান। মুটে মজুর আর বাবুতে কোনো তফাৎ নেই। সে পলাতক বেড়ালের মতো ঘাপটি মেরে দেখে। সে বুঝতে পারে জীবনের সব ক্ষেত্রেই মানুষ মানুষকে ঠকায়। একদিন সে দেখতে পায়– এক লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। পেছনে তাড়া করছে

এক মহিলা। শোনে তার অকথ্য গালাগাল– 'এই খানকি মাগির পুত; ট্যাহা না দিয়া পালাস ক্যান? ট্যাহা নাই পকেটে? কাম করবার সময় মনে ছিল না? ফুটানি মারতে আইছোস? এই ফকিরনির পোলা... '। লোকটা টাকা না দিয়ে পালাচ্ছে। পেছনে ছুটছে একজন নারী। তার দেহ বিক্রির টাকা মেরে দিয়ে পালায় একজন প্রতারক পুরুষমানুষ। এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যায় সবুজ। এ ও কী সম্ভব? সে দেখতে পায় মেয়েটা লোকটার নাগাল না পেয়ে ছুটতে ছুটতে এক পর্যায়ে তার পা থেকে স্যান্ডেল খুলে ছুঁড়ে মারে। কান্না আর গালির শব্দ মিশে একাকার হয়ে যায়। সবুজ আর বুঝতে পারে না তার কথাগুলো। ক্যাসেটের ফিতে জড়িয়ে যাওয়া রেকর্ডের মতো তার কথাগুলো অস্পষ্ট শব্দদূষণ সৃষ্টি করে।

ঘরে ফিরে কোনো কাজ নেই সবুজের। লোডশেডিং তো আছেই। ফ্যানও নেই। গরমে নিজেই আলুসেদ্ধ। অসহ্য যন্ত্রণা। রাতে ফিরে দুপুরে রান্না অবশিষ্ট ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে, নইলে আলু ভাতে মেরে দিয়ে; পুরনো, ছেঁড়া বড়ালের বিসিএস গাইডটা একু নাড়াচাড়া করে। বালিশের নিচ থেকে বের করে পর্ন পত্রিকা পড়ে, পড়া শেষ করে আবার রেখে দেয় বালিশের নিচে। তাতে ইন্টারভিউতে পাস করে চাকরির পথ কতটা সুগম হবে তা সে জানে না; তবে একটু সান্ত্বনা পাওয়া যাবে এইটুকু জানে। তাই বেশ রাত করেই সে বাসায় ফেরে। সান্ধ্য আড্ডা শেষ হলেই সে বেরিয়ে পড়ে জীবন-দর্শনে। পার্কের আলো আঁধারিতে হাঁটে; দেখে সে আলো আঁধারির খেলা। কাছ থেকে। জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে সে দেখে জীবনের তামাশা। তারপর রাত হলে এইসব জীবন-যাপনের প্রতি থুতু ছিটিয়ে ফিরে আসে বাসায়। এই তার নিত্যদিনের যাপিত জীবন। দৈনন্দিন কর্মসূচি।

মনটা খুব ভালো সবুজের। আজ রেজাল্ট দেবে। চাকরিটা হযে যেতে পারে। কিন্তু স্যান্ডেলটা ক্ষয়ে যাওয়ায় মনটা খারাপ লাগছে। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে; যদিও দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে স্যান্ডেলের তলিটা ক্ষয়ে গেছে। দু'একদিনের মধ্যে তালি দিতেও পারবে না। পকেটে আছে মাত্র দশ টাকা। বাকি দু'দিন চলতে হবে ধার করে। তার চোখেমুখে কেমন এক অসহায়ত্বের ছাপ। সে কারণেই হয়ত মনে হয় সবুজ কাঁদছে।

রাস্তার মোড়ে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে এক গেলাস পানি খেয়ে নিল সবুজ। শুধু পানি খেতে পয়সা লাগে না। জলে ক্ষিধে মরে। বহুদিন পর গতকাল একটা মিষ্টি খেয়েছে সবুজ। সেই মিষ্টির স্বাদটা মনে করে পানি খেল। মিষ্টিটা দিয়েছিল আয়েশার মা। এনামেল উঠে যাওয়া এ্যালুমিনিয়ামের পিরিচে ফ্রিজ থেকে বের করা ঠাণ্ডা একটা বাসি মিষ্টি; আর পাশে ছোট্ট একটা চামচ। সাথে এক গেলাস পানি। ঠাণ্ডা। গতকাল মিষ্টি দেয়ার একটা কারণ ছিল। আজ তার চাকরি হতে পারে এ খবর আগেই সবুজ তাদের জানিয়েছে। তাই এ আদর। এ আদর পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে সে চাকরি পাওয়ার কৃত্রিম গল্পও ফাঁদে।

পানি খেতে খেতে কসিরুদ্দিনের বউয়ের মুখটা আয়েশার মুখে পরিণত হয়ে যায়। আয়েশা তাকে ভালোবাসে বোঝা যায়। সেদিন মিষ্টিটা শেষ হতে চায়ের কাপ হাতে আয়েশা। মিষ্টি হেসে চায়ের কাপ রাখতে রাখতে বলে– 'আপনার এই চাকরিটা হয়ে গ্যালে সবচেয়ে বেশি খুশি কে হবে বলেন তো?' অতকিছু না ভেবে সবুজ বলে ফেলেছিল– 'কেন, আমার মা?' বলতেই সবুজ লক্ষ করল মরা চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল আয়েশার মুখ। আয়েশার ঠোঁটের সেই মিষ্টি হাসিটা তখনও ছিল; কিন্তু কেমন বাসি ফুলের মতো। সবুজের খারাপ লেগেছিল– বোকার মতো কোনোকিছু না ভেবেচিন্তে বেফাঁস বলে বেচারিকে কষ্ট দিয়েছে। আয়েশার করুণ মুখটা মনে পড়তেই তার ভেতরটা হুহু করে উঠল। মনে মনে ভাবে– চাকরিটা হয়ে গেলে আয়েশার মনের কথা জেনে নেবে। আয়েশা ছোট্ট একটা টুনটুনি হয়ে তার পাঁজরের ডালে বসে। ডালটা একটু দুলে ওঠে। মনে পড়ে আরেকজনের কথা। গ্রামের। পাশের বাড়ির আসমা। টাকার অভাবে মাধ্যমিক দেয়া হয় নি। সবুজের সাথে তার বেশ ভাব। ঢাকা চলে আসার সময় তার ছলছল চোখটা সবুজের মনে পড়ে। বলেছিল– 'চিঠি দেবে তো?'

প্রথম প্রথম নিয়মিত চিঠি লিখত সবুজ। আসমাও লিখত। তারপর আসমার চিঠি আসত কিন্তু সবুজের আর ঘন ঘন লেখা হতো না। চিঠি প্রতি ডাকমাশুল এক টাকা থেকে দু'টাকা করেছে সরকার। প্রতিটা চিঠি পোস্ট করতে এখন দু'টাকা লাগে। সবুজের জন্য সেটাও সমস্যার হয়ে গেল। একসময়ে আসমার চিঠি আসত, সবুজের চিঠি যেত না। কবে যেন একদিন আসমার চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম প্রথম আসমার চিঠি না

এলে মনটা খারাপ হয়ে থাকত সবুজের। চিঠি পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকত। ধীরে ধীরে আসমার চিঠি আসা বন্ধ হলেও সবুজ টের পেল না যে বসন্তের পাঁজরের ডালে নতুন পাখির শিস্, তখনই আসমা নতুন করে হাওয়ায় দোলা দিয়ে উঠল। একই সাথে আয়েশা এবং আসমা দু'জনের জন্যই মনটা হু হু করে উঠল সবুজের।

দু'গেলাস জল মেরে দিয়ে আবার পথে নামে সবুজ। পথ মানে রাস্তা। কালো পিচ ঢালা রাস্তা। মাথার উপরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর আর পায়ের তলে কালো রাস্তা। এটাই যেন সবুজের কাছে একমাত্র সত্য। হাঁটছে। হাঁটাই যেন তার একমাত্র কাজ। হঠাৎ তার মনে হয়, পিচঢালা কালো রাস্তাটা যেন কোনো পেন্সিলের দাগ। বিরাট এক কাগজে কোনো শিশু এলোপাতাড়ি দাগ দিয়ে রেখেছে। সে সেই দাগের উপর দিয়ে হাঁটছে। নাকি সেও দাগের উপর দিয়ে দাগ কাটছে। সে কি তবে এক চলন্ত পেন্সিল? দাগ কাটতে কাটতে ক্ষয়ে যাবে? রাজপথে হাঁটছে সবুজ। নিজেকে চলন্ত পেন্সিল মনে হচ্ছে। এক সময় সে অনুভব করে পেন্সিলের নিচে যেন জ্বালা করছে। ক্ষয়ে যাচ্ছে। থামে। ডান পা-টা তুলে দেখে– স্যান্ডেলের ছেঁড়া দিয়ে রাস্তা তার দাঁত বসিয়েছে পায়ে। কালোর মাঝে ছোপ ছোপ লাল উঁকি দিচ্ছে। জ্বালাটা না থাকলে, দেখতে মন্দ নয়। ইচ্ছে করেই গতিটা কমিয়ে দেয়। দেখলে মনে হবে আয়েশ করে হাঁটে। ছেঁড়া চটি পায়ে হাঁটায় অনেক হ্যাপা। জীবনটা যেন ছেঁড়া স্যান্ডেল। টেনে টেনে চলা।

দুই

এক সময় পৌঁছে যায় গন্তব্যে। দোতলার সিঁড়িতে পা দিতেই হার্টবিট বেড়ে যায় সবুজের। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই সবুজ অফিসার। চাকরিটা পেয়ে যাবে। মানে চাকরি প্রাপ্তদের নামের তালিকায় তার নাম দেখবে। তার নামটা কোথায় থাকবে? এক নম্বরে? নাকি মাঝের দিকে? নাকি শেষে? থাক, এক জায়গায় থাকলেই হলো। বোর্ডে তার নাম থাকার সাথে সাথেই তার মায়ের অসুখ ভালো হয়ে যাবে। বোনের গায়ে উঠবে নতুন জামা। তার স্যান্ডেলে তলি লাগবে। না, ওটা ফেলে দেবে। নতুন চটি হবে। একটা জামাও কিনবে। এটা কোনো ফকিরকে দিয়ে দেবে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠে আর ভাবে। ভাবে আর ওঠে। হার্টবিট বাড়তে থাকে। মনে হয় এরপর থেকে যখনই সে এভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে দারোয়ান হাসিমুখে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম ঠুকবে– 'সেলামআলায়কুম স্যার, শরীর ভালো?' সে বলবে– 'মোটামুটি, একটু গ্যাস হয়েছে এই যা'। হঠাৎ মনে পড়বে তার স্ত্রী এ্যান্টাসিড দিতে ভুলে গেছে। স্ত্রীর মুখটা মনে আসে। তাঁতের শাড়ি পরেছে। কিন্তু স্ত্রীর মুখটা যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে আয়েশার মুখ। একবার মনে হচ্ছে আসমার মুখ। আয়েশা-আসমা, আসমা-আয়েশা– এভাবে মুখের লুকোচুরি খেলা চলে। কোনোভাবে স্থির হয় না মুখ। দোতলায় উঠে আসে। দারোয়ান বসেই থাকে। সালাম দেয় না। 'সালাম দেয় না কেন?' হঠাৎ তার খেয়াল হয়– সে তো রেজাল্ট নিতে এসেছে। এখনই সালাম দেবে কেন? দেখে অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে। কেউ উৎফুল্ল। কেউ মলিন মুখ। তার হার্টবিট আরো বেড়ে যায়। ওই তো বোর্ড। নিজেকে খুব হাল্কা মনে হয়।

পা-টা ভারি। যেন চলছে না। এত হাঁটতে পারে সবুজ আর এটুকু পথ পেরুতে পারবে না? এই দশ-বারো হাত এগিয়ে আসতে যেন দশ-বারো বছর লেগে গেল সবুজের। তবু পৌঁছল। বোর্ডে ফোকাস করল। প্রথম থেকেই নামগুলো ঝটপট পড়তে লাগল। লাফিয়ে লাপিয়ে। দ্রুত। তার তর সইছিল না। হঠাৎ নামের লিস্ট শেষ। ভাবল জাম্প করে যাওয়াতে তার নামটা চোখে পড়ে নি। এবার তাই ধীরে, এক এক করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। দৃষ্টি ওপরে নিয়ে ফোকাস এ্যাডজাস্ট করতে মনোনিবেশ করে। কিন্তু আশ্চর্য! ফোকাস এ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। কী মুশকিল! তাহলে সে তার নামটা পড়বে কী করে? ইতোমধ্যে অক্ষরগুলো একটার গায়ে একটা জড়িয়ে গেছে। শুধু কি তাই? অক্ষরগুলো যেন জড়াজড়ি করে নড়াচড়া করছে। গুয়ের পোকার মতো কিলবিল করছে। কী আশ্চর্য! অক্ষরগুলো ইংরেজি না বাংলা তাই বোঝা যাচ্ছে না এখন। অক্ষরগুলো কেমন দাঁত উঁচিয়ে হাসছে। ওদিকে চোখের ফোকাস কোনোভাবেই ঠিক হচ্ছে না। সে মরিয়া হয়ে চেষ্টা

করছে। এবার সে শুধু উপর থেকে নিচ করছে দৃষ্টি। কিন্তু অক্ষরগুলো আরও সচল হয়ে উঠছে। আশ্চর্য! এমনও কি কখনও হয় নাকি? অক্ষরগুলো মৌমাছির মতো ভনভন করছে। এবার উড়ছে। একটা নয়, দু'টো নয়, শতশত মৌমাছি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে। সবগুলো নাম উড়ছে। তার নামও মৌমাছি। গুনগুন। ভারি মজা। কিন্তু এ কী? মৌমাছি তার গায়ে হুল ফোটাচ্ছে। তার চোখেও। সে কি মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছে নাকি? তাহলে অক্ষরগুলো মৌমাছি কেন? চোখ বন্ধ করে ফেলে সবুজ। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে। বসে পড়ে। পাশেই দারোয়ানের টুলটা খালি ছিল। আকাশ জুড়ে মৌমাছি। আর মগজ ঘিরে হুল।

চোখের সামনে থেকে মৌমাছি সরে যেতে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ায় সবুজ। হাল্কা নয়। পা-টা খুব ভারি মনে হয়। দু'পায়ে দু'মণই পাথর বাঁধা। ব্যথা। ধীরে ধীরে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। তলপেটে চাপ। টয়লেটে ঢুকে পড়ে। পেচ্ছাব করা খুব জরুরি। পেচ্ছাব করতে গিয়ে ইচ্ছে জাগে– প্যানের মধ্যে করবে না। দেয়ালে ছিটিয়ে দেয় পেচ্ছাব। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দেয়ালে আঁকিবুকি আঁকে উষ্ণ জলের ধারায়। হঠাৎ তার খেয়াল হয় দেয়ালে সে বটগাছ আঁকবে। পেচ্ছাবের বটগাছ। তাই আঁকে। পাশে এক লম্বা তালগাছ। দেয়ালচিত্র এঁকে বাইরে আসে। বেসিনে এসে ভালো করে চোখে, মুখে, নাকে জলের ঝাপটা দেয়। তারপর ভিজা জামার হাতায় মুখ মুছে হাঁটা শুরু করে। বোর্ডের দিকে আর তাকায় না। ততক্ষণে অফিস লন প্রায় খালি। দারোয়ান তার টুলে বসা। সালাম ঠোকে না। সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে নামে। এবার সে সিঁড়ি গুণে গুণে নামে। নিচে। যেন কত সিঁড়ি নিচে নেমে যাচ্ছে তার হিসেব খুব জরুরি।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আবার চলন্ত পেন্সিল। গন্তব্যহীন। কিন্তু এবার গতি ধীর। ক্ষিধে নেই। তৃষ্ণাও। বাসায় যাবার দরকার নেই। পড়াতেও যাবে না আজ। কী বলবে গিয়ে তাদের? তার চাকরি হয় নি? নাকি হয়েছে; তবে অক্ষরগুলো পড়তে পারে নি? হঠাৎ করে কেমন মৌমাছির মতো ওড়াউড়ি শুরু করল। শুধু কি ওড়াউড়ি? গায়ে, চোখে, মুখে পর্যন্ত হুল ফোটাতে শুরু করল। দিশেহারা নদীর মতো সে গতিপথ পাল্টাতে থাকল। যতই গতিপথ পাল্টাক, নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছায়, সবুজও তেমনি ড. আহমদ শরীফের আড্ডায় গিয়ে পড়ল। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দি পার্ক তখনও ফাঁকা। তখনও আড্ডা বসে নি। কেউ আসে নি। ড. আহমদ শরীফ যেখানে বসেন, সেখানে তার বসার সাধ হলো। বসল। আহমদ শরীফের ভঙ্গিতে সামনে বসে থাকা অদৃশ্য জনতার উদ্দেশ্যে সে বলতে লাগল নানা কথা। একসময় সে সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখল– সামনে বসে তার ভাষণ শুনছে চার-পাঁচজন শিশু; বাদাম বিক্রেতা, পানি বিক্রেতা এবং টোকাই। একটু লজ্জা পেয়ে হেসে দিয়ে– 'একটু রিহার্সেল দিচ্ছিলাম আর কী'।

রোদের তেজ পড়ে নি তখনও। একটু ছায়ার খোঁজে সে একটা ঝোপের কাছে চলে আসে। বসে। দেহটা শীতল হয়ে যায়। হঠাৎ ফুসুর ফাসুর কানে আসে। ডালপালার ভেতর দিয়ে ঝোপের অন্য পাশে চোখে পড়ে জড়াজড়ি করে বসে থাকা যুবক-যুবতী।

ছেলেটা– তোমার মাকে বলেছ?

মেয়েটা– কী বলব? তোমার চাকরি নেই এ কথা শুনলে মা রাজি-ই হবে না।

– এবার দেখো হয়ে যাবে। ইন্টারভিউটা ভালোই দিয়েছি।

ঝোপের এ পাশে সবুজ আপন মনে গাল দেয়– চাকরি না বাল হবে নে। এত সোজা? আমার হলো? চাকরি ভরে মুতি।

বিড়বিড় করে এসব বলতে বলতে ঝোপের ওপাশে দেখে– দু'টো দেহ এক হয়ে মিশে গেছে। ছেলেটার মুখের মধ্যে মেয়েটার ঠোঁট অদৃশ্য। সেও মনে মনে দু'জন হয়ে যায়। তার বাহুবন্ধনীর মধ্যে আয়েশা কিংবা আসমা। কে, তা ঠিক বুঝতে পারছে না। চোখ বন্ধ করে সবুজ। আয়েশা কিংবা আসমা কারো মুখই মনে করতে পারছে না। তার মাথা এখন ফাঁকা। সাদা। কোরা কাগজ। মনে হলো এখানে কোনো লেখা নেই, রেখা নেই; কোনো ছবি নেই। কিছুতেই কোনো ছবি ভেসে উঠছে না স্মৃতির সে সাদা কাগজে। তার প্রবল কান্না পায়। এরা কেউ-ই তার হবে না। কে বিয়ে করবে বেকারকে না খেয়ে মরতে? ওই যে ঝোপের ওপাশে যে মেয়েটা

তার সর্বস্ব দিয়ে দিচ্ছে অনায়াসে একটা যুবককে, সেও ওই যুবককে বিয়ে করতে চাইছে না চাকরি নেই বলে। কী আশ্চর্য পৃথিবী! চাকরি হবে শুনেই না আয়েশার মা তাকে একটা মিষ্টি খেতে দিয়েছিল। আর কি দেবে? কেউ যেন তার মনের পাতা থেকে ইরেজার দিয়ে মুছে দেয় পেন্সিলে আঁকা ছবি।

কোনোভাবেই সে মনে করতে পারে না আসমা কিংবা আয়েশার মুখ। একটা কষ্ট দলা পাকিয়ে আটকে থাকে গলার কাছে। মন থেকে চেহারা কীভাবে মুছে যায় সে বুঝতে পারে না। মনে পড়ে– ছেলেবেলায় খাতা ভরে ছবি এঁকে রেখেছিল। একবার দোয়াত থেকে কলমে কালি ভরার সময় দোয়তটা খাতার উপর কাৎ হয়ে পড়ে গেলে, পুরো ছবি কালিতে ঢেকে যায়। ছবিটা হয়ে যায় কালো কালির মাঠ। কোনোভাবেই আর ছবিটা উদ্ধার করার উপায় থাকে না। সে কী কান্না তার! বাবা সান্ত্বনা দিয়েছিল। আজ মনে হয় আর একবার তার মনের পটে আঁকা ছবির উপর কেউ কালির দোয়াত উল্টে দিয়েছে; আর কোনোভাবেই উদ্ধার করা যাবে না তার চেতনার রঙে আঁকা ছবি। তার কল্পনা-সঙ্গীকে। বাবার মুখটা মনে পড়ে। বাবা যদি যুদ্ধে না যেত তবে আজ তারা এমন করে পথে বসতো না। ছেলেবেলায় বাবার মুখে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছিল। পাকিস্তানি আর্মির সাথে গোলাগুলির এক পর্যায়ে বাবার উরুতে গুলি লাগে। পাশে ছিল জয়নাল চাচা। গুলিতে মারা যান। জলকাদামাখা ধানক্ষেতে পড়ে থাকে বাবা। অজ্ঞান অবস্থায় পরদিন এলাকাবাসী উদ্ধার করে তাঁকে। রাজাকারের ভয়ে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয় নি। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার চিকিৎসা করেন গোপনে। আর যুদ্ধ করতে পারেন নি। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু তিনি পঙ্গু হয়ে গেলেন। টাকার অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা করানো যায় নি। ভুগে ভুগে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রেখে তিনি মারা যান। সেই থেকে তারা এতিম। বাবা বলেছিল– আমি যখন গুলি খেয়ে ধানক্ষেতে পড়ে ছিলাম অজ্ঞান হয়ে, তখন তোর ওই কালো হয়ে যাওয়া ছবিটার মতো আমারও সব স্মৃতি কালো হয়ে গেছিল। আশা ছাড়বি না।

কালো এক কালকেউটে সবুজের মগজের মধ্যে কিলবিল করে আর বিষ ছড়ায়। সবুজ দগ্ধ হতে থাকে। সময় ছুটে যায় ঝোপের ছায়া ছুঁয়ে। সবুজ দেখতে পায় ঝোপের ওপাশ যুগল-শূন্য। পার্কের নিয়ন বাতি জ্বলে উঠেছে। অলস কুকুরের মতো উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দেয়। তারপর হাঁটা শুরু করে ড. আহমদ শরীফের মজলিসের দিকে। শুরু হয়ে গেছে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সে গিয়ে পিছনের দিকে ফাঁকা একটা জায়গা দেখে বসে পড়ল। কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। সে যেন শুকনো পাতা। গাছের ডাল থেকে এইমাত্র খসে পড়ল। কারো দৃষ্টি কাড়ল না। সন্তর্পণে সবার দিকে তাকায়। দেখে। সবাইকে এফোঁড় ওফোঁড় করে পর্যবেক্ষণ করে। সবাই ড. আহমদ শরীফের দিকে তাকিয়ে আছে। সবুজই শুধু চোরের মতো সবাইকে দেখছে। সে যেন সবার মনের ঘরে চুরি করছে। ধরা পড়ার ভয়ে বুকের মধ্যে ধুকপুক। সবুজের মগজের মধ্যে চিন্তার এক চিল ডিগবাজি খায়। এখানে যারা সবাই হাঁ করে ড. শরীফের কথা গিলছে, এদের কেউ কি তার মতো? একজনও কি আছে? নাকি মনের ক্ষত লুকিয়ে গান্ধীজি মার্কা মুখ করে বসে আছে? এতলোক প্রতিদিন কী জন্যে আসে? কোন আশায় বা কোন হতাশায়? সবাই কি তার মতো প্রলেপ দিতে আসে? আজকের আড্ডাটা কেমন যেন জমছে না। কিংবা জমছে কিন্তু সবুজের মনটা ভালো নেই বলে হয়ত তার কাছে মনে হচ্ছে জমছে না। অবশ্য তার মন তো প্রায়শই খারাপ থাকে। তবে আজ একটু বেশি খারাপ।

তিন

আড্ডা শেষ হয় এক সময়। 'সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী; ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন, থাকে শুধু অন্ধকার...'। আড্ডার সবাই যে যার বাসায় ফেরে। ফেরে না শুধু সবুজ। কোথায় ফিরবে? তার জন্যে তো কোনো 'বনলতা সেন' অপেক্ষায় বসে নেই। আছে শুধু সিন্দুকের মতো একটা ঘরে আরশোলা, চামচিকে, মাকড়সা। তিন ফুট বাই সাত ফুট একটা খাটে দু'জন। এর চেয়ে পার্কই ভালো। উদোম আকাশ, খোলা বিশাল ঘাসমাঠ। আজ সে সারা মাঠ গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুমুবে। পুরো পার্কটাই তার বিছানা। পুরো পার্কটাই তার ঘর। খুব হাল্কা লাগছে শরীরটা। মনটাও। যেন ফাটা কার্পাস তুলো। ভেতর থেকে কী এক বেগ তাকে ঠেলে। মুক্ত। নিজকে মনে হয় লাগাম ছেঁড়া। স্যান্ডেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ছুটছে। ছেঁড়া জামা প্যান্টও তার ছুঁড়ে

ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু সে সময় কই? সে ছুটছে। যে কেউ দেখলে মনে করবে ডাকাতের তাড়া খাওয়া মানুষ। সবুজের পায়ের নিচে সবুজ, থেঁতলে যাচ্ছে কচি কচি ঘাস। সে ছুটছে। যেন ছুটবে সারারাত। সারা জীবন। যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ সে ছুটবে; যেন এই তার পণ।

ছায়া যেখানে গাঢ়; ঝোপ-গাছগাছালির ভিড়– দূর থেকে দেখতে পায় সবুজ মানুষের কিউ। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে দশ-বারোজন মানুষ। যেন কলপাড়ে জল নিতে আসা মানুষের লাইন। রেশনের দোকান খুলল নাকি? সব জায়গাতেই মানুষের হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, মারামারি; কে আগে যাবে, আগে পাবে– এই মতলব। এই একটা জায়গায় মানুষকে চুপচাপ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এত কষ্টের মধ্যেও তার ভালো লাগল। সে ব্রেক কষল। গতিবেগ কমিয়ে দিক পাল্টে সে লাইনটার দিকে এগুলো। আবছা আলোয় মানুষগুলোকে প্রেতের মতো লাগছিল। প্রেত লাইনের সামনে যেখানে এক টুকরো অন্ধকার বিছানো, সেখানে কী যেন নড়েচড়ে উঠছে। কিছু না ভেবেই প্রেত লাইনের শেষে এসে সবুজ দাঁড়িয়ে যায় জাদুর টানে। আবছা আলোয় পেছন থেকে মুখগুলো দেখা যায় না। ভালো করে লক্ষ করতে চেষ্টা করে সবুজ– সামনে কী একটা নড়েচড়ে মাটিতে বিছানো ঘাসের শয্যায়। তার পাশে একজন প্রেত লাইনের দিকে মুখ করে, চারদিক ঘুরেঘুরে নিলাম ডাকে–

– আহেন, আহেন, মাত্র দশ ট্যাকা, একদাম দশ ট্যাকা, সস্তায় দশ ট্যাকা, নিলামবালা দশ ট্যাকা, কী চমৎকার দশ ট্যাকা, ভারি মজা দশ ট্যাকা, আহেন ভাই দশ ট্যাকা।

সবুজ বুঝে উঠতে পারে না এটা কোন ধরনের রেশনের দোকান। মাত্র দশ টাকায় কী পাওয়া যায়? সবুজের মনে পড়ে– তার পকেটেও দশ টাকা আছে। পকেটে হাত দিয়ে সে নিশ্চিত হয়। আছে। দশ টাকা। তার শেষ সম্বল। রাতের খাবার। প্রয়োজন নেই। এতক্ষণ তার ক্ষিধের বোধ ছিল না। খাবারের কথা মনে পড়তেই পেটের অজগরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু পাত্তা দিল না।

শেকলের গাঁটের মতো একটা একটা করে খসে যায় মানুষ কিংবা মানুষ আকৃতির প্রেত। দাঁড়ানো মানুষগুলো একটা একটা করে পড়ে নিচে, মাটিতে, বিবর্ণ ঘাসে। লাইনটা ছোট হয় কিংবা এগিয়ে যায় কিংবা এগোয় না, জায়গাতেই থাকে শুধু গাঁটগুলো এগিয়ে যায়। এরকম করে এগিয়ে যায় সবুজও। কাছ থেকে দেখে সবুজ এবার বুঝতে পারে। পেছন ফিরে দেখে তার পেছনেও শেকলের গাঁট এসে জুড়েছে। সে এখন শেকলের মাঝখানে। শেকলের গাঁট ছোটে কিন্তু শেকল ছোট হয় না। কী এক আশ্চর্য জাদুর শেকল! তলপেটে সবুজ দু'রকম ব্যথা টের পায়। খাবারের কথা মনে হতেই যেমন তার ক্ষিধে কামড় বসিয়েছে পেটে, সামনের নড়াচড়া দেখেও তলপেটে ফণা তুলেছে কাম। সবুজ বুঝে উঠতে পারে না কী করা উচিত বা কী সে করবে। পকেটে মাত্র দশ টাকা।

দু'টো ক্ষুধা। প্রতিটারই দাম দশ টাকা। কিন্তু তার পকেটে একটিই মাত্র দশ টাকা। ভেবে পায় না– শ্যাম রাখে, না কূল রাখে। ছোট না হওয়া শেকলের সামনের গাঁট ছোটে, সবুজ এসে পড়ে প্রান্তে। কানে আসে– 'আহেন দশ ট্যাকা, নিলামবালা দশ ট্যাকা, একদাম দশ ট্যাকা ... '। কথাগুলো যেন এক একটা বুলেটের মতো তার কানে এসে আঘাত করে। ঢুকে পড়ে মগজে, চৈতন্যে। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে জ্বালা। কী করবে সে? সে দেখতে পায় চোখের সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে আয়েশা আসমা প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়ায়। কাউকে সে নাগাল পায় না। ধরতে পারে না। ছুঁতে পারে না। জীবনে হয়ত কোনো নারীই আসবে না তার। এক গণ্ডূষ জল যখন হাতে এসে ধরাই দিল, তাকে উপেক্ষা কেন? পান করাই উত্তম। সততা আদর্শ শুকনো পাতার মতো পায়ে দলে গুঁড়ো হয়ে যায়।

শেকলের প্রথম কিংবা শেষ গাঁট সবুজ। একটু পরেই সে খসে যাবে। সামনে তার মায়াবী হাতছানি। পেছন ফিরে তাকায়। যেখানে সে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল, লাইনের শেষে, সেখানে এখন অন্য মানুষ। লাইনটা এখনও ততটুকুই। শেকলটা যেন ছোট হতে জানে না। সামনে এক একটা গাঁট খসে পড়ে, আবার পেছনে এক একটা গাঁট জোড়া লাগে। এ এক অদ্ভুত শেকল।

A chain of unending. সবুজ ভাবে এক বিকেল না খেলে মানুষ মরে না। আজ নবজন্ম লাভ করি। একটা ক্ষিধে মিটাই আর একটা উপোস দেই। অদ্ভুত এক অনুভূতি খেলা করে সবুজের মনে। কানে আসে–

'আহেন ভাই, দশ ট্যাকা ফেলেন, এ্যাডভান্স'। ভৌতিক আলোয় সবুজ দেখতে পায় ঝোপের ছায়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে এক উদোম শরীর। বেশরম নারী। এখানে লজ্জাহীনতাই যেন নারীর ভূষণ। এর আগে এ দৃশ্য কখনও দেখে নি সবুজ। নাগালের কত কাছে নারী। মাত্র দশ টাকায় এক উদোম শরীর। মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়– 'এ্যাডভান্স মানে?'

– 'বোঝেন না, কাম শ্যাষ, তো খানকির পুতেরা ট্যাকা না দিয়াই দৌড় লাগায়। হক্কলেরেই চেনা আছে। এরা আবার ভদ্দললোক! বেশ্যার গতর বেচা দশ ট্যাকাও মারতে চায়। ফ্যালেন, ট্যাকা ফেলেন'। পকেটে হাত দেয় সবুজ। বের করে আনে দশ টাকার একটা নোট। এখন অবশ্য ভেজা নেই। ঘাম শুকিয়ে গেছে। তবে নোটা কেমন ওই মেয়েটার মতোই নেতানো। এগিয়ে দেয়। মেয়েটা লুফে নেয় মুঠোতে। দশ টাকা নয়, যেন একটা স্বর্গ। সবুজ টের পায় সব নোটগুলো মেয়েটার হাতে। তার দালাল শুধু নিলাম ডেকে ডেকে খদ্দের যোগাড় করে। দালালটাকেও মেয়েটা বিশ্বাস করে না। উদোম গা বলে কোচরও নেই যে টাকা রাখবে। তাই এক হাতের মুঠোয় আবদ্ধ মুঠো মুঠো লজ্জা।

সবুজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে– সে যখন শেষে এসে দাঁড়িয়েছে লাইনের শেষে; তখনও তার সামনে ছিল দশ-বারো জন। এর আগেও হয়ত ছিল আরও কিংবা পরেও হয়ত আসবে আরও। কম করে হলেও ত্রিশ জন উপগত হয় এক নারীতে। জন প্রতি দশ টাকা, মানে ত্রিশ জনে তিনশো টাকা। মেয়েটা তিনশো টাকা মুঠো করে বাড়ি ফেরে? মানে মাসে ৩০ × ৩০০ = ৯,০০০ টাকা। সবুজ হতভম্ব হয়ে যায়– মেয়েটার মাসিক বেতন; না বেতন নয়; মাসিক রোজগার ৯,০০০ টাকা! সবুজ শুনেছে এখান থেকে কিছু টাকা কমিশন দিতে হয় দালালকে, কিছু পার্কের মাস্তানদের, আর কিছু কর্তব্যরত পুলিশকে। তারপরও হয়ত সাত-আট হাজার টাকা থাকে। ভাবে– চাকরির চেয়ে তো এটাই ভালো। ইনভেস্ট ছাড়া ব্যবসা। পরক্ষণেই মনে পড়ে– সে তো পুরুষ মানুষ। তার কাছে কে আসবে দশ টাকা নিয়ে।

ডাক আসে– 'আহেন, তরতরি আহেন, টাইম কম'।

সবুজ ভাবে কত সহজ সম্ভাষণ, সে যেন তার চিরদিনের চেনা। অচেনা পুরুষকে আহ্বান যেন জল-ভাত। সবুজের মগজের ভেতর ঝাঁকে ঝাঁকে তেলাপোকার ওড়াউড়ি। সে যেন সম্পূর্ণ চেতনা রহিত।

তখনও শেকল থেকে খসে পড়ে নি সবুজ। সে খেয়াল করে– ঝোপের ছায়ায় মেয়েটি তার বিবর্ণ সবুজ শাড়ি বিছিয়ে শয্যা পেতেছে কামের। দশ টাকার বিনিময়ে আহ্বান জানাচ্ছে একটি প্রেতের শেকল। শেকল থেকে এবার খসে পড়ে সবুজ। নিচু হয়। সে টের পায় প্যান্টের শক্ত কাপড় ঠেলে, ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার পৌরুষ। প্যান্টের চেন খোলে। হুক খোলে; বাইরে বের করে আনে উদ্ধত, শক্ত মাংস শলাকা। টের পায় অগ্রভাগ পিচ্ছিল, অন্তর্বাস উষ্ণ, ভেজা। মোহনার কাছাকাছি ঝুঁকে আসে সবুজ। যেন এখনই ভেঙে চুরমার হয়ে হারিয়ে যাবে অতলে। কিন্তু কী এক দুর্গন্ধে ভারি বাতাস। সবুজের গা গুলিয়ে ওঠে। ওয়াক আসে। চারদিকে রমণের গন্ধ, বাতাসে নানা প্রেতের পৌরুষের গন্ধ। এক একটা প্রেত উঠে যায়, আর মেয়েটি একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলে তার কামসিক্ত উরু। ন্যাকড়াটাও ভেজা হয়ে ওঠে। গন্ধে বমি আসে। কোনোভাবেই আর নিচু হতে পারে না সবুজ। উদোম শরীরের কণ্ঠনালী চিরে চিৎকার বেরিয়ে আসে– 'দেরি করেন ক্যান? আহেন ভাই। শিগগির আহেন, টাইম কম'।

সবুজের কানে জ্বালা ধরে– মেয়েটা তাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করে সঙ্গমে আহ্বান জানাচ্ছে। মানুষগুলো কি পশু? এভাবে দশ টাকার বদলে ত্রিশজন একটা মেয়েকে ভোগ করবে? আবার ভাবে– অবশ্য সে কারণেই মেয়েটা এত রোজগার করতে পারছে। নইলে তো উপোস দিতে হতো। সে নিজকে মেয়েটার জায়গায় ভাবে– সবুজ যদি মেয়ে হতো, তার যদি সুযোগ থাকত, তাহলে সেও কি আজ নামত না এই ব্যবসায়? আজ সে দশ

টাকা দিয়ে মেয়েটার কাছে আসত না, বরং তার কাছেই দশ টাকা করে দিয়ে ত্রিশজন আসত। মেয়ে হয়ে না জন্মানোর জন্য সবুজের আফসোস হয়। সবুজ দোদুল্যমান।

– কী অইলো, নেন, কাম সারেন। চোদাইবার আইসা অত ভাবেন ক্যান? হালার কত পাগোল দ্যাখলাম। নেন, লাগান। তরতরি লাগান।

গা ঘিনঘিন করে ওঠে সবুজের। সে থুক্ করে একদলা থুতু ছুঁড়ে দেয় মেয়েটার গায়ে। উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটা কঁকিয়ে, ডুকরে, চেঁচিয়ে, দুহাতে মুখ চেপে কেঁদে ওঠে। দশ টাকার নোটটা ছুঁড়ে দেয় সবুজের দিকে– ভিক্ষা দ্যান, ভিক্ষা? ভিক্ষা আমি নেই না। গতর বেইচা দাম নেই। করুণা করেন? কত ভদ্দললোক দ্যাখলাম। আমি ইচ্ছা কইর‍্যা খারাপ হইছি? ঢাকা শহরে আইছিলাম প্যাটের লাইগ্যা।

চার

সবুজ ঘুরে দাঁড়ায়। সত্যি তার অন্যায় হয়ে গেছে। এভাবে ঘৃণা করা উচিত হয় নি। তার পাপ বোধ হয়। তাকিয়ে দেখে মেয়েটি যে সবুজ শাড়িটা বিছিয়ে শুয়েছে– তা বিবর্ণ, ধূসর, ফ্যাকাসে। নিয়ন বাতির মরা আলোয় মেয়েটিকে মৃত মনে হয়। শাড়িটা বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো বিছানো। বারোয়ারি মেয়েটি যেন মানচিত্রের আত্মা। ধর্ষণক্লিষ্ট যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মৃত মুক্তিযোদ্ধা বাবার কথা মনে পড়ে যায়। পা টলতে থাকে সবুজের। থরথর করে কাঁপে সারা শরীর। মেয়েটির চিৎকার সহস্র ধর্ষিতার আর্তচিৎকার হয়ে আছড়ে পড়ে বাতাসে। সবুজ দেখতে পায়– বে-আব্রু পড়ে আছে বাংলাদেশ। তার সামনে ধর্ষণোন্মুখ প্রেতের শেকল। অন্তহীন কিউ। আজ আবার তার স্মৃতির কাগজে কালির দোয়াত উল্টে গেছে। সব কিছু অন্ধকার দেখে। হঠাৎ কি সব আলো নিভে গেল শহরের? বাবার মুখটা মনে করতে চেষ্টা করে। কালিতে লেপ্টে গেছে। সবুজ চিৎকার করে ওঠে– বাবা!

প্রহর

পাকিস্তানি পাতাকাটা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল বাড়ৈ বাড়ির সুখচাঁদ। পাতাকা টাঙানোর বাঁশটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাঠে, এমনভাবে যে মনে হলো শ্মশানে মড়া পোড়ানো শেষের অপ্রয়োজনীয় বাঁশ ওটা। সবচেয়ে ছোট বলে অজয় ছিল লাইনের প্রথমে। মাত্র সাত বছর। ক্লাস ওয়ান। স্কুল শুরুর আগে একে অন্যের কাঁধে হাত রেখে জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো 'পাক সার জমিন সাদ বাদ ... পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, পুরব বাংলা শ্যামলী মায় ... ।' অজয় সবার সামনে বলে তার হাত নিচেই থাকত; কারো কাঁধে রাখার প্রয়োজন হতো না। স্কুল শুরুর আগের এই ব্যাপারটা তার ভালোই লাগত। কিন্তু ওইদিন হঠাৎ কী হলো ক্লাস ফোরের ধাড়ি ছেলেটা, যে নাকি বারবার ফেল করে এবং যার হাত-পায়ের লোম বড় বড়, বড় মানুষদের মতো এবং যার সবে মোচ গজিয়েছে, সেই সুখচাঁদ হঠাৎ কোথা থেকে এসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাঁশটা ধরে, পতাকাটা নামিয়ে ঝটকা টানে পুরনো ন্যাকড়ার মতো ফড়ফড় ছিঁড়ে ফেলল এবং সবাইকে তাড়িয়ে দিল। শ্লোগান ধরল– 'পাকিস্তান, নিপাত যাক; পাকিস্তান, নিপাত যাক।' শিকলের মতো লাইনটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল মুহূর্তে। তবে সেদিন থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। সবাই বলাবলি করছিল যুদ্ধ লেগেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেক লোক জড়ো হয়েছিল বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়। মদনকাকার ধনুকের মতো বাঁকা তালগাছটায় উঠে অনেকে দেখছিল এদেশের মাটিতে প্রথম জ্বলে ওঠা এরকম আগুনের লেলিহান শিখা। বোলতলি বাজার ওখান থেকে পাঁচ/ছয় মাইল। জ্বলছে পুরোটা। আকাশ ছুঁতে চায় কুণ্ডলায়িত ধোঁয়া। তার উত্তাপ এবং অভিশাপ যেন তাদের ছোঁয়। আনন্দগুলো ইঁদুর ছানা হয়ে গর্তে সেঁধিয়ে যায়; কপালে রেখে যায় দুশ্চিন্তার বালুচরি ভাঁজ। রাত বাড়ে। আগুনের রঙ মেখে চোখে বিছানায় যায় মানুষ। রাতে শুয়ে অজয় প্রশ্ন করে– বাবা, যুদ্ধ কী?

অজয়-সুজয় দু'ভাইকে মাঝখানে রেখে দু'পাশে বাবা আর মা শোয়। এক বছরের ছোট সুজয় বলে ওঠে– হেঁ, যুদ্ধ চেনে না, যুদ্ধ অইলো গিয়া খেলা। বাবা চুপ মেরে থাকে। অজয় আবার বলে–

– বাবা, পাতাকাডা ছেঁড়লো ক্যান?

– ওডার আর দরকার নাই; হেই জন্যে।

– বাবা, বাজারে আগুন দেছে ক্যান?

– এ্যাহোন গুমাও বাবা, কাইল কবোনে।

রাত পোহালে এলাকার তরুণ সংঘের কয়েকজন যুবক গেল বোলতলি বাজার দেখতে। গোবিন্দ, শফিক, ভবসিন্ধু, রমেশ আর সুশীল বোলতলি থেকে ফেরার পথে মেশিনগানের গুলির নিচে পড়ল। কাৎ হয়ে শুয়ে রাস্তা থেকে গড়িয়ে পড়ল নিচে, খালের ভেতর। আর ভেসে উঠল না। রক্তে লাল হয়ে গেল জল। নাক জাগিয়ে পড়ে থাকল মড়ার মতো। মিলিটারি ফিরে গেলে ওরা বাড়ি ফেরার কথা ভাবছে। গোবিন্দর বাম হাতের কনুইয়ে এবং সুশীলের ডান হাঁটুতে লেগেছে গুলি। ওরা উঠতে গিয়ে টের পেল সুশীল হাঁটতে পারছে না। তার ডান পা অচল। কাঁধে ধরাধরি করে সন্ধের দিকে তারা রক্ত-মাখা পাঁচ জন গ্রামে ফিরল। পুলপার বটতলা দোকান ঘরের কাছে এসে দোকানের বেঞ্চিতে লম্বা করে শুইয়ে দিল সুশীলকে। পা থেকে রক্ত ঝরছে তখনও। হাঁটুতে আটকে রয়েছে গুলি। ধারাল ছুরি হ্যারিকেনের আগুনে পুড়িয়ে হরিপদ ডাক্তার সুশীলের হাঁটু খুঁচে খুঁচে বের করে আনল পাকিস্তানি মেশিনগানের গুলি। শত শত লোক জড়ো হয়ে গেল মুহূর্তে। সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত-নীরব। এত লোক অথচ কোনো শব্দ নেই। যেন সব পাথরের মূর্তি। শ্মশানের নিস্তব্ধতা। রক্ত মাখানো গুলিটা দোকানির কাঁসার থালায় রাখল ডাক্তার। ছোট্ট একটা ঠুন্ শব্দ হলো। অথচ শব্দটা যেন ছোট্ট নয়; ভয়ানক, বিকট এক আর্তনাদ। গুলির স্পর্শ পেয়ে কাঁসার থালাটা যেন চিৎকার করে উঠল। শব্দ আতঙ্ক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রত্যেকটা হৃৎপিণ্ডে। শব্দটা শেষ হলো না; গেঁথে থাকল প্রত্যেকের বুকে।

পরদিন সাতপাড় বাজারের শিবু পোদ্দারের মুদির দোকানে আগুন দেবার আগে মিলিটারিদের শখ হলো শিবুকে কেরোসিনে স্নান করানোর। শিবুর দোকানে হাতের কাছেই পাওয়া গেল কেরোসিনের টিন। টিন ধরে উপুড় করে দিল শিবুর মাথায়। তারপর ফজর আলি মেম্বার বলল– 'দে দৌড় হালার মালাউনের পুত। বাঁচতি চালি পালা।' পা দু'টো ভারি দু'মণই দু'টো পাথর, তবু শিবুর সে কী খরগোশ দৌড়! কিন্তু শিবু তখনও জানে না, ম্যাচকাঠি জ্বলে উঠেছে পেছনে। ছুঁড়ে দিয়েছে তার দিকে। টের পেল তখন, যখন আতশবাজি হয়ে জ্বলে উঠেছে শিবু। উদ্ভ্রান্ত ছুটছে একজন অগ্নিমানব। সে এক দৃশ্য বটে! গায়ের গেঞ্জি, লুঙ্গি সব দৌড়তে দৌড়তে খুলে ফেলছে শিবু। কিন্তু আগুন নেভে না। তৃষ্ণার্ত জিভে কেরোসিন চেটে ততক্ষণে চর্বির স্বাদ পেয়েছে আগুন। শিবু দৌড়য় ... আগুন দৌড়য় ... পুকুর খোঁজে ... তার চামড়া পুড়ে সাদা; চামড়া পোড়া গন্ধ দৌড়য় ... শিবুর চিৎকার দৌড়য় ... । এক সময় আধপোড়া আস্ত মানুষের রোস্ট হয়ে শিবু পড়ে থাকে রাস্তার ধারে; বাতাসে তার গন্ধ ভাসে। তখনও রোস্ট হয় নি যারা, নাকে কাপড় চাপা দিয়ে তারা দেখে শিবু মুদির রোস্ট।

অজয়ের বাবা অনিল সে দৃশ্য দেখে ফিরে এসে রাতে আর খেতে পারে না। নাকে লেগে রয়েছে শিবু মুদির রোস্টের গন্ধ। বমি আসে; ওক আসে। অজয় একটু একটু বুঝতে পারে– এই-ই বুঝি যুদ্ধ। চোখ বুঁজলেই সে শিবু পোদ্দারের রোস্ট দেখে। দেখে, শিবু দৌড়ায় জ্বলন্ত মানুষ। মাঝে মাঝে ভয় হয়– হয়ত শিবু নয়; তার বাবা। বাবা নয়ত?

– বাবা, মাইনসে মাইনসেরে মারে ক্যান?

– মাইনসে মাইনসেরে মারে না বাবা; পশুতে মাইনসেরে মারে।

– বাবা, আমাগো বাড়িতেও কি আগুন দেবে?

বাবা কথা বলে না। প্রেতপুরীর মতো নিস্তব্ধ গ্রাম। সারা গ্রাম মনে হয় ঘুমন্ত। কিন্তু কারো চোখে ঘুম নেই। রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে চোখ থেকে। ভোরবেলা সূর্য ওঠে– আলো নয়, আগুন হয়ে; আতঙ্ক হয়ে; আতঙ্ক নিয়ে। এখানে ওখানে জ্বলে ওঠে বাড়ি। মানুষ পালায়। প্রাণভয়ে ছুটে যায় বিলের দিকে। দিনে পালিয়ে থাকে; রাতে ফিরে আসে ঘরে। সূর্যোদয়ের আগে ঘর ছাড়ে; ঘরে ফেরে সূর্যাস্তের পর। প্রতিদিন বাড়ি পোড়ে, ঘর পোড়ে, মানুষ পোড়ে। গুলিবিদ্ধ হয় মানুষ। স্বপ্নপোড়া মানুষেরা চিরকেলে বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে পালায়। প্রতিরাতে প্রত্যেক বাড়ির কোনো না কোনো একটি পরিবার পাড়ি জমায় ভারতের উদ্দেশ্যে। অজয়দের বাড়ির অর্ধেক খালি। কিছুতেই ভারতে যেতে চায় না অনিল। যেতে চাইলেও সম্ভব নয় যাওয়া। অজয়-সুজয় নাদুস-নুদুস দুই ভাই আদরে বড় হয়েছে। অত পথ হাঁটতে পারবে না। তাছাড়া স্বাস্থ্য ভালো থাকায় কাঁধে বা কোলে করেও তাদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাতে হয়ত বেঘোরেই প্রাণটা যাবে। তার চেয়ে দেশের মাটিতেই মরা ভালো। তাই ভারতে যাবার পরিকল্পনা বাতিল হয়।

কিন্তু অজয়-সুজয় দু'ভাইকে নিয়ে বিলের জলে পালিয়ে বাঁচাও সম্ভব নয়। দু'দিন বউ বাচ্চা নিয়ে অনিল পালাতে গেছিল বলবাড়ির পাথারে। গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে কচুরির মধ্যে নাক জাগিয়ে পুরো দিন বসে থাকাটা খুবই কষ্টের। তারপর কখনও ঢোড়া সাপ চলে যায় গায়ের উপর দিয়ে; কখনও জোঁক লাগে গায়ে। আর অজয়-সুজয় চিৎকার দিয়ে ওঠে। তাতে অন্যরা খেপে যায়। শত শত কালো কালো মাথা জলের উপর কচুরির মধ্যে দেখা যায় বল বাড়ির পাথারে। সারাদিন জলের মধ্যে থাকায় ঠাণ্ডা লেগে দু'জনের দু'দিনেই কাশি হয়ে গেছে। অনিল ভেবে কোনো কিনারা করতে পারে না।

বুদ্ধিটা অবশ্য অনিলের বউ নির্মলার মাথা থেকেই বেরয়–

– হোনো, আমি এ্যাট্টা কতা ভাবছি, ঘরামিগো আর বাড়েগো এই দুই পুকুরের মইদ্দেহানে যে জঙ্গল, বিরাট বেতের ঝোপ; তার মইদ্দে থাকতে পারে না অজয় আর সুজয়?

– কীভাবে থাকবে? ভয় করবে না?

– বেতের ঝোপের মইদ্দে বাঁশের মাচান বানাইয়া, তার উপার এট্টা কাঠের বাক্স বানাইয়া দিলে অরা থাকতে পারে না?

– শেয়াল, বাগডাসা, খাটাশের ভয় পাবে না? তাছাড়া সাপখোপ আছে। হায়েনা আছে।

– তক্তা দিয়া এ্যাট্টা বাক্স কইর‍্যা দ্যাও। বেইল ওঠোনের আগেই অগো দুইজনরে বাক্সের মইদ্দে রাইখ্যা তালা মাইরা যাবো। সইন্ধ্যার পর তালা খুইল্যা নিয়া আসবো।

– ক্ষিধা লাগলে খাবে কী?

– কৌটা ভইর‍্যা চিড়া আর গুড় রাইখ্যা যাবো। আর এক কলস জল।

– পায়খানা-পেচ্ছাব পাইলে কী করবে?

– নিচের এ্যাট্টা তক্তা আলগা রাখবা। পায়খানা-পেচ্ছাব পাইলে তক্তাখান উঠাইয়া করবে। আর পাশের তক্তা গুলান সামান্য এট্টু ফাঁক ফাঁক কইর‍্যা লাগাবা যাতে গরমে মইর‍্যা না যায়।

অজয় আর সুজয়ের সারাদিনের গা ঢাকা দেবার জায়গাটা এমনই নিরাপদ হয়েছে যে বেতের ঝোপ কেটে পরিষ্কার না করলে তাদের অস্তিত্বই টের পাওয়া যাবে না। সকালে বাক্সের মধ্যে দু'জনকে ভরে তালা বন্ধ করে বাবা-মা চলে যায় বলবাড়ির বিলে; সন্ধের পরে ফিরে তালা খুলে বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে দিনেও সেখানে শেয়াল ডাকে, দৌড়ে যায় বেজি; তক্তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সাপের ফণা কিংবা একেবেঁকে চলে যাওয়া গোখরো। দু'ভাই জড়াজড়ি করে নিশ্চুপ পড়ে থাকে সকাল থেকে সন্ধে। তাদের পৃথিবীতে আসে না কখনও উজ্জ্বল দিন। এভাবেই কেটে যায় একেকটা প্রহর।

দুই তক্তার মাঝখানে সাপ ঢোকার মতো ফাঁক নেই। কিন্তু যে সামান্য ফাঁক তা দিয়ে সাপের জিভ ঢুকে যায়। সেদিন দুপুরে হিস্ হিস্ সাপের জিভটা ভিতরে ঢুকে গেলে চিৎকার দিয়ে ওঠে দুই ভাই। কনুইয়ে বেঁধে উল্টে যায় জলের কলস। তেষ্টা পেলেও এক ফোঁটা জল পায় না খেতে। শুকনো চিড়ে আর গুঁড় তেষ্টা দেয় আরও বাড়িয়ে। অপেক্ষায় থাকে কখন সন্ধে হবে; কখন রাত নামবে; তখন বাবা এসে নিয়ে যাবে। বাড়ি ফিরে জল খেতে পাবে। বাড়ি ফিরেই মা রান্না চড়ায় প্রতিদিন। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবে। চিন্তাগুলো কষ্ট হয়ে; কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসে চোখে। কালো কালো অশ্রুগুলো কালো অন্ধকারে মেশে।

পাকা জামের মতো সন্ধেটা ফিকে থেকে আরও গাঢ় হয়। গাঢ় অন্ধকার আঠালো আলকাতরার মতো লেগে থাকে চারপাশ। সেই ঘন দুর্ভেদ্য দেয়ালে নিয়ত জ্বলা-নেভা জোনাকিদের ছোট ছোট ছিদ্রের মতো দেখায় ঝোপের ভেতর। হায়েনার চোখ জ্বলে ওঠে তক্তার ফাঁকে; শেয়াল ডেকে যায় চারপাশ ঘুরে। বাবা আসে না। পিপাসায় জিভ শুকিয়ে যায়। সাপে-বেজিতে যুদ্ধ; ফোঁস ফাঁস। ভয়ে বুকের রক্ত হিম। কথা বলে না। বাজপাখি কড়কড়ড়ড়ড়ড় ... করে ওঠে ... বাবা আসে না। মা আসে না। ওদের বিশ্বাস– বাবা আসবে ... মা আসবে ... রাত যতই হোক; বাড়ি ফিরিয়ে নেবেই তাদের। তৃষ্ণায় ... ভয়ে ... প্রতীক্ষায় ... প্রত্যাশায় ... ক্লান্তিতে ... ঢলে পড়ে দু'ভাই। রাত কত ... ওরা জানে না ... বিশ্বাস ... বাবা আসবে, মা আসবে ... শেয়াল আর ডাকবে না ... নিভে যাবে হায়েনার চোখ।

অজয়ের চোখে নেমে আসে হিমশীতল ঘুম। ভাইয়ের নিথর দেহ আঁকড়ে সে দেখতে পায় চারদিকের বেড়া, বাক্সের তক্তা গলিত মাংসের মতো খসে খসে পড়ে। মানুষের গন্ধ চোখে জ্বেলে, হিংস্র থাবা বিস্তার করে চারপাশ ঘিরে আছে শেয়াল আর হায়েনার দল। দাউ দাউ জ্বলছে তাদের ঘর। মানুষের রোস্টের গন্ধ নাকে এসে বিঁধে। দেখে, শিবু পোদ্দারের মতো গায়ে আগুন মেখে বাবা দৌড়ায়। মুণ্ডু নেই; শুধু ধড়।

রাজাকার

(বিধান চন্দ্র বিশ্বাস শ্রদ্ধাস্পদেষু)

লোকটা নড়ছেও না, গুলিও ছুঁড়ছে না। অস্ত্রটা উঁচিয়েও ধরছে না। রাইফেলটা লাঠির মতো ধরে কাকতাড়ুয়ার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আধো আলো আধো অন্ধকারের আবছায়ায়। যেমনি দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই থাকল। স্থির ছায়ামূর্তি। যেন কোনো প্রাচীন ভাস্কর্য অচেনা অন্ধকারের। এমন সঙ্কটেও মানুষ পড়ে? বুকের ভেতর বুনো আতঙ্ক নিঃশব্দে চিৎকার করে। দম বন্ধ হয়ে আসে। গলায় যেন আটকে আছে শুকনো মাটির ঢেলা। আমি প্রস্তুত। অস্ত্র সজ্জিত। সে বন্দুক তাক করার সাথে সাথেই ট্রিগার চেপে দেব। কিন্তু আক্রমণ না করলেতো আগে আগে কিছু করতে পারি না। শুধু শুধু কাউকে খুন করা যুদ্ধের ধর্ম নয়। তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ট্রিগারে হাত। বুকে অদ্ভুত এক উৎকণ্ঠার শীতল পারদ ছলকায়। তার উদ্দেশ্যও বোঝা যাচ্ছে না। রাজাকার ক্যাম্পের পাহারাদার যেহেতু, এটা বোঝা যাচ্ছে, সে একজন রাজাকার। কিন্তু মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না। কী বিপদ আছে কে জানে? মুহূর্তগুলো বিভীষিকাময়। প্রতিটা মুহূর্ত বিষাক্ত সাপের ছোবল-আশঙ্কাক্লিষ্ট ফণার মতো ভয়াল।

কুলিয়ারচরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ইন্ডিয়া থেকে আমরা ফিরছিলাম কসবা বর্ডার হয়ে কিছু গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। উদ্দেশ্য কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম। সেখানে অবস্থিত মিলিটারিদের একটা গানবোট ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা চার জন নেভাল কমান্ডো– আমি, টেকেরহাটের আলি আহমেদ, মাদারীপুরের শাহাবুদ্দিন এবং খুলনার আব্দুর রহিম। গেরিলা বাহিনীর দেড়শো সদস্য আমাদের সাথে। আমি ছিলাম টিম লিডার। অস্ত্রবিদ্যায়, নির্দেশনায় আমার দক্ষতায় তাদের বেশ শ্রদ্ধা ছিল। তাই বেশ সমীহ করত তারা। ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলছি আমরা সরীসৃপের মতো ছোট ছোট কতগুলো নৌকোয়। মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে হাইওয়ে। রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিতে হবে রেলওয়ে ব্রিজ। মিলিটারি জিপ টহল দিচ্ছে ব্রিজের উপর দিয়ে। শব্দ করে রাস্তা কাঁপিয়ে অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, একটু পরেই আবার ফিরে আসে। পাশেই রাজাকার ক্যাম্প। এখান দিয়েই যেতে হবে আমাদের। অন্য কোনো পথ নেই। বেশ কিছুটা জায়গা পেরুতে হবে সন্তর্পণে। নৌকোয়। একসাথে কয়েকজন করে পার হচ্ছে। ভাগে ভাগে। আমি সবার শেষে যাব সঙ্গত কারণেই। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসে। ভোর হতে আর বাকি নেই। রাত্রির কালো পর্দা ছিঁড়ে একটু পরেই পুব আকাশ রাঙিয়ে উঠবে নতুন দিনের রক্তিম সূর্য।

শেষ নৌকোয় আমরা মাত্র চারজন। পরনে গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট। একটা বস্ত্রার মধ্যে চারটে স্টেনগান। এক এক জনের কাছে তিনটা করে ম্যাগজিন। প্রতিটা ম্যাগজিনে ত্রিশটা করে গুলি। আর গোটা চারেক করে গ্রেনেড। এ সব একটা বস্তার মধ্যে। বুঝতে পারি নি রাত তখন প্রায় শেষ। পুব দিক লাল হয়ে উঠেছে। ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার। বাকি জায়গাটা পেরুতে পেরুতে চারদিক ফর্সা হয়ে যাবে। সামনেই রাজাকার ক্যাম্প। বুঝতে পারছি না কী করা যেতে পারে। কোথাও কোনো লোকজন তখনও দেখা যায় নি। মনে হলো ক্যাম্পের সবাই ঘুমিয়ে। এটাই ভরসা। হঠাৎ ব্রিজের কাছে মাটি ফুঁড়ে দাঁড়াল একটা লোক। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। এখন উপায়? ওখানেইতো রাজাকার ক্যাম্প। নিশ্চই ও রাজাকার। আরও কাছাকাছি চলে এসেছি ততক্ষণে। দেখি লোকটার হাতে একটা লাঠি। শ'খানেক গজ দূর পৌঁছেই বুঝতে পারলাম ওটা আসলে লাঠি নয়, রাইফেল। ভয়ে রক্ত হিম হয়ে আসে। ঝট্ করে একটা স্টেনগান বের করে নৌকার গুঁড়ার উপর রাখলাম। একটা ম্যাগজিন ভরে রেডি করে রাখলাম। আর দু'টো ম্যাগজিন প্যান্টের ভেতর ঢুকিয়ে নিলাম। মাথার চুল খাড়া। চল্লিশ/পঞ্চাশ গজ দূরত্ব থাকতেই নৌকার মাঝি সাদেক বলল– 'কী করেন, কী করেন, বিপদ ঘটাবেন। ওটা বস্তার মধ্যে ঢুকান। চুপ করে থাকেন। কিচ্ছু হবে না'। আমার বিশ্বাস হলো না। সাদেক বলল– 'ওগুলা বস্তার মধ্যে ঢুকান। নইলে বিপদ হবে'। আমি কথাটায় গুরুত্ব দিলাম না। আগে প্রাণ বাঁচানো ফরজ। নৌকাটা আরও কাছে চলে এল। কিন্তু লোকটা লাঠির মতো রাইফেলটা ধরেই রয়েছে কিন্তু

উঁচিয়ে ধরছে না। তাক করছে না। সে তাক না করলে আমি কিছুই করতে পারছি না। আমি ভাবছি সে রাইফেল তাক করলেই আমি ঝট্ করে গুলি চালিয়ে দেবো। কিন্তু সে কিছুই করছে না। আমি বুঝতে পারছি না কী করব। ব্রিজের কাছেই লোকটার একেবারে কাছে চলে এসেছি। সে নির্লিপ্ত। যেমনি রাইফেল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়েই থাকল। স্থির। পুব দিগন্ত আরও রক্তিম হয়ে উঠল। ভয়ে হাত-পা কাঠ। কোনো বোধ কাজ করছে না। বুঝতে পারছি না কী করা উচিত। যা ভাবি নি হঠাৎ সে তাই করে বসল। অকল্পনীয় এ কাণ্ডে আমরা হতবাক। একেবারে তার কাছাকাছি আসতেই বাঁ হাতে রাইফেল ধরে এ্যাটেনশন করে ডান হাত তুলে সে স্যালুট করল। আমরা হতভম্ব। যার গুলি ছোঁড়ার কথা, সে স্যালুট করে বসল। আমরা বিস্ময়াস্তব্ধ। এটা তার কৌশল কি না, তা-ও বুঝতে পারছি না। হঠাৎ যন্ত্রচালিতের মতো আমিও স্যালুট করলাম। কিন্তু সচেতন থাকলাম পরিস্থিতির জন্য। ব্রিজ পেরুনো পর্যন্ত তার হাত কপালে ঠেকানোই থাকল। নির্বিঘ্নে আমরা ব্রিজ পেরিয়ে গেলাম। কিছুই ঘটল না। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগল বেশ কিছুটা।

সাদেক বলল– 'স্যার, এরা রাজাকার, কিন্তু কাউরে মারে না। যারা এ পথ দিয়া যায়, তাগো কাছ থিইক্যা জনপ্রতি চার আনা কইর‍্যা নিয়া ছাইড়্যা দেয়। যাগো কাছে পয়সা থাকে না, তাগো এমনিতেই ছাইড়্যা দেয়। আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থিইক্যা কোনো পয়সা নেয় না। উল্টা নিরাপদে ওপারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা কইর‍্যা দেয়। এ দলে আমার পরিচিত লোক আছে। চাচাতো খালাতো ভাই আছে। গ্রামের লোক আছে। আমার নিজের ভাইও আছে। এইজন্যিই কইছিলাম, ভয় পাবেন না। কিচ্ছু হবে না। এরা ভালো রাজাকার। আমাগো গ্রাম পাকিস্তানি আর্মি থিইক্যা রক্ষা করার জইন্যে হগলে মিল্যা মিটিং কইর‍্যা ভাগ ভাগ কইর‍্যা দেয় যে, এরা আওয়ামী লীগ করবে, এরা মুসলিম লীগ করবে, এরা মুক্তিযোদ্ধা অবে, আর এরা রাজাকার অবে। আসলে এ গ্রামের হগলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক। হগলেই ভিতরে ভিতরে এক। বাঁচার জন্যে এইডা একটা কৌশল। এ জায়গার সব রাজাকার ভালো রাজাকার'। সাদেকের কথায় বিস্মিত হলাম। রাজাকাররা খারাপ বলেই জানতাম। জানা ছিল না যে ভালো রাজাকারও থাকে। রাজাকারও ভালো হতে পারে।

নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলাম রেলওয়ে ব্রিজ, রাজাকার ক্যাম্প। রায়পুরের বেলাব বাজারের বিপরীত দিকে 'পাকিস্তান বাজার'। বাজারের পাশে প্রাইমারি স্কুল। বন্ধ। ছাত্ররা আপাতত মৃত্যুর প্রহর গোনে। স্কুলে গেরিলা ক্যাম্প। পাশেই ব্রহ্মপুত্র নদ। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম গেরিলারা রাজাকারদের ধরে ধরে নিয়ে এসে বেঁধে রেখে দেয়। খেতে দেয় না। জলও স্পর্শ করতে দেয় না। তিন-চার দিন পর কয়েকজন রাজাকার জমলে, পাঁচ-সাত জন হলে, তাদের প্রত্যেকের হাত দু'টো পেছনে বেঁধে এবং পা দু'টো এক করে বেঁধে ব্রহ্মপুত্র নদে ঠেলে ফেলে দেয়। প্রথমে কিছুক্ষণ সাঁতরাতে চেষ্টা করে। কিংবা কচুরিপানা কামড়ে ধরে বাঁচার আকুতিতে। তারপর ডুবে যায়। আমরা বুঝাতে চেষ্টা করলাম যুদ্ধ মানেই মানবতার বিপর্যয় নয়। মানুষ খুন নয়। ইন্ডিয়ান আর্মি রাজাকারদের খুন করা পছন্দ করে না। তারা বলে– Don't kill Razakar. রাজাকাররা সবাই খারাপ লোক নয়। ভালো রাজাকারও আছে। দায়ে পড়ে অনেক সময় অনেকে রাজাকার হয়েছে। কেউ কেউ কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে রাজাকার হওয়া। এদের মধ্যেও দেশপ্রেম আছে। তাছাড়া এরা শোধরাতেও পারে। তাই এদের মারা যাবে না। বরং চেষ্টা করা যেতে পারে তাদের ফিরিয়ে আনতে। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজে লাগাতে। আমরা চলে গেলাম না। ক্যাম্পেই থেকে গেলাম।

ইতোমধ্যে আমাদের কাছে খবর এল এলাকার বিশিষ্ট ধনী মুসা মিয়ার পেট্রোল বার্জ ডুবাতে হবে। শহর থেকে বার্জ ভরে পেট্রোল আসে মিলিটারি জিপে ব্যবহারের জন্য। পেট্রোল সাপ্লাই বন্ধ হলে মিলিটারি জিপ চলতে পারবে না। তাই পেট্রোল সাপ্লাই বন্ধ করার জন্য বার্জটা ডুবিয়ে দিতে হবে। এ কাজের জন্য যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সে জন্য কিছুদিন থাকতেও হবে। আমরা চার জন চার বাড়িতে থাকব। শরণার্থী হিসেবে থাকব। গোপনে তথ্য সংগ্রহ করব। এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী মৌলভিবাড়ি। মুসা মিয়ার বাড়ি। পেট্রোল বার্জের মালিক। আমি থাকার জন্য সেটাই বেছে নিলাম। জঙ্গলে বাঘের গুহায় আশ্রয় নেয়াই সবচেয়ে

নিরাপদ। কারণ, বাঘ ছাড়া অন্য কোনো ভয়ের কারণ থাকে না সেখানে। মুসা মিয়া মুসলিম লীগের নেতা। তার বাড়িতে থাকলে সে অন্তত মিলিটারিদের আমাদের খবর জানাবে না। তাহলে গেরিলারা তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাছাড়া পেট্রোলভর্তি বার্জের যথাযথ তথ্য ওখানেই পাওয়া যাবে। মুসা মিয়ার বাড়িতে গিয়ে থাকার প্রস্তাব দিলাম। তারা আমাকে সাদরে থাকতে দিলেন। তাদের বাড়িতে একটা ঘরে আমার থাকার জায়গা হলো। অন্য তিনজন আশেপাশের তিনটা বাড়িতেই আশ্রয় নিল।

মুসা মিয়ার স্ত্রী কখনও সামনে আসেন নি। তাকে দেখতে পেতাম না। কথা শুনতাম। বেড়ার ওপাশ থেকে কথা বলতেন। ভারি কণ্ঠস্বর। আভিজাত্য আছে। রমজান মাস। ভোরবেলা উঠে তাদের সাথে আমার সেহ্‌রি খেতে হবে। আমি খেতে চাইতাম না। কিন্তু কোনো উপায় নেই। বেড়ার ওপাশ থেকে ঠিকই বলতেন– 'বাবা, খাও। তুমি না খেলে আমি খেতে পারি? তুমি না খেলে আমি খাব না। খেয়ে নাও'। এই মায়াভরা নির্দেশ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। সকালে আবার নাশ্‌তা। পরোটা ভাজি ডিম পোচ। চা। রীতিমতো অত্যাচার। কিন্তু বেড়ার ওপাশ থেকে ঠিকই মৃদু অনুশাসন– 'ছেলে ছোকরা মানুষ খেতে চাচ্ছ না কেন? রান্না কি ভালো হয় নাই? না খেলে তোমার কষ্ট হবে। তোমার মা খেতে দিলে তুমি কি খেতে না? মায়ের কথা ফেলতে পারতে?'। রীতিমতে হুকুম। অগত্যা খেতেই হতো। ওখানে বিশ-পঁচিশ দিন থাকতে হয়েছে আমাদের। তাদের ছোট ছেলেটার বয়স সাত কি আট বছর। সে আমাকে মুসলমান বানাবেই। নানাভাবে চেষ্টা চালায়। আমি বলি– মুসলমান হলে লাভ কী?

সে বলে– হুরি পাবেন।

বলি– হুরি মানে কী?

সে বলে– তা আমি জানি না। তবে খুব সুন্দর জিনিস। পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

– কোথায় পাওয়া যায়?

– বেহেশতে পাওয়া যায়। আপনি মুসলমান হলে অনেক হুরি পাবেন।

– আর কী কী পাওয়া যায়?

– অনেক কিছু পাওয়া যায়।

সময় কাটানোর জন্য আমি তার সাথে গল্প করতাম। তাকে মাঝে সাজে অঙ্ক ইংরেজি বিজ্ঞান পড়াতাম। ক'দিনের মধ্যে পরিবারটির সাথে কেমন যেন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে গেল। পর্দানশিন এক মুসলিম মহিলা হিন্দুর ছেলেকে নিজের ছেলের মতো এতটা স্নেহ করবেন, আদর-যত্ন করবেন, তা একেবারেই চিন্তার বাইরে। তাও মৌলভিবাড়ি। মুসলিম লীগের নেতার স্ত্রী। কেমন এক মায়ার সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম।

ক'দিন বাদে ওবাড়িতে এসে হাজির পেট্রোল কোম্পানির দু'জন লোক। তারা খবর পেয়েছে মুসা মিয়ার পেট্রোল বার্জ ডুবিয়ে দেয়ার পরিকল্পনার। তারাও আমার মতো ওবাড়িরই অতিথি। তারা আমাকে বলে, এলাকায় নাকি ফ্রগম্যান এসেছে পেট্রোল বার্জ ডুবিয়ে দেয়ার জন্য। তাদের কাছে ইসরায়েলের দেয়া শক্তিশালী লিম্পেড মাইন আছে। বার্জটা ডুবিয়ে দিলে পেট্রোল কোম্পানির বিরাট লোকসান। বার্জ মালিকের কোনো লোকসান নেই। বীমা করা আছে। তাই তারা আসছে নেভাল কমান্ডোদের সাথে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু তারা তাদের চেনে না। আমরা কোনো সন্ধান দিতে পারি কিনা জানতে চায়। চোরের কাছেই চোরের খোঁজ। এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না বলে জানালাম। বেশ কয়েকদিন একই সাথে থাকতে থাকতে তাদের সাথেও কেমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এর পরে আর বার্জটা ডুবানো সম্ভব হলো না। কী এক বোধ বাধা দিল। আমরা আমাদের পরিকল্পনা ত্যাগ করলাম। আমাদের কাছে খবর এল, ইতোমধ্যে অষ্টগ্রাম থেকে গান বোটটি সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কী আর করা? এবার ফেরার পালা।

আশুগঞ্জের সাইলোতে আর্মি কোয়ার্টার। এখান থেকে ট্রেনে করে আর্মি গোলাবারুদ নিয়ে কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ হয়ে চলে যায় বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত। পথে রেলওয়ে কালভার্ট। এলাকার লোকে বলে ছয়শতি

ব্রিজ। এই ব্রিজ ছিল এ এলাকার ত্রাস। পাকিস্তানি আর্মি এ পথেই এলাকায় ঢোকে। মুক্তিযোদ্ধারা এ ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করল। কয়েকজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা একটা নৌকায় করে বেশ কয়েকদিন চেষ্টা চালায় ব্রিজটি ধ্বংস করতে। ব্যর্থ হয়। বেলাবো বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। যখনই তারা নৌকায় করে রাতের অন্ধকারে ব্রিজের দিকে যাবার চেষ্টা চালায় তখনই বেলাবো বাজারের ক্যাম্প থেকে গুলি ছোঁড়ে। ওরা জানে না যে ওটা গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা। গেরিলাদের কাছে প্রায় ২৮০ কে.জি. বিস্ফোরক। ২০০ কে.জি. প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, টি.এন.টি. দুই বাক্স, দুই বাক্স গান-কটন। কোনোভাবে একটা গুলি এসে যদি তাদের নৌকায় লাগে তাহলে এমন বিস্ফোরণ হবে যে তারা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো সুরাহা হলো না। নৌকার টের পেলেই ক্যাম্প থেকে গুলি ছোঁড়ে। তারা আমাদের কাছে খবর পাঠাল। আমাদের সাহায্য চাইল।

আমরা ভেবে দেখলাম, ক্যাম্প থেকে যাতে গুলি না ছোঁড়ে এজন্য তাদের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কে যাবে ওখানে? যাওয়াটা বিপদের। আলি আহমেদকে নিয়ে আমি বেলাবো বাজারে যাই। ক্যাম্পে ঢোকার সাথে সাথেই অপরিচিত দেখে তারা আমাদের অ্যারেস্ট করে ফেলে। আমরা জানালাম যে আমরাও মুক্তিযোদ্ধা। বিশ্বাস করল না। দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমাদের গুলি করে মেরে ফেলবে। বোঝাতে চেষ্টা করলাম, তা কোনোভাবেই বোঝে না। পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু পরিচয় দেয়া যাবে না। বললাম–

– কেন, আমাদের গা থেকে মুক্তিযোদ্ধার গন্ধ পাও না গর্দভ? মুক্তিযোদ্ধা কি গায়ে লেখা থাকে? আমরা এসেছি খালি হাতপায়ে, কোনো অস্ত্র নেই আমাদের সাথে। মুক্তিযোদ্ধা না হলে খালি হাতে আসার সাহস করতাম?

– তোমরা যে মুক্তিযোদ্ধা, তোমাদের কাছে তার কোনো প্রমাণ আছে?

– এই, তুমি তুমি করে বলো কেন? আপনি করে বলো? প্রমাণ কী? যুদ্ধের স্বার্থেই তোমাদের কাছে এর বেশি কিছু বলা যাবে না। জরুরি পরামর্শ আছে। তোমাদের কমান্ডারকে ডাকো। শুধু শুধু বিপদ ডেকে এনো না।

গরিমসী করছে দেখে বললাম– আমাদের মেরে ফেললে তোমাদের লাভ কী? আমাদের মেরে ফেললে তোমরা একটাও বাঁচবা না। ক্যাম্পের সবকটাকে মেরে ফেলবে। আমরা অনেক পাওয়ারফুল অফিসার। উপরের নির্দেশে এসেছি। তোমাদের কমান্ডারকে ডাকো।

কমান্ডারকে ডাকল। তাকে বুঝালাম বিষয়টা। বললাম–

– বাঙ্কার খুঁড়ে এখানে ক্যাম্প করে কোনো লাভ নেই। তোমরা দু'শো মুক্তিযোদ্ধা আছো। সব মারা পড়বে। ওই যে সাইলো দেখা যায়। এখান থেকে খুব কাছেই। তিন চারশো রাজাকার আর মিলিটারি এই ব্রিজ দিয়ে এসে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে হবে। রাতের অন্ধকারে আমরা নৌকায় করে আসব। টর্চ লাইট দিয়ে সঙ্কেত দেব। তোমরাও সঙ্কেত দেবে। খবরদার, গুলি ছুঁড়বে না। কাজ চুকিয়ে আমরা চলে যাব।

অনেক বুঝানোর পর রাজি করানো গেল। কিন্তু মুস্কিল একটা আছে। ব্রিজের গোড়াতেই রাজাকার ক্যাম্প। তারা টের পেলে কোনোভাবেই আর ব্রিজের কাছে ঘেঁষতে দেবে না। মেরে ফেলবে। সিদ্ধান্ত হলো ২০০ মুক্তিযোদ্ধা ল্যান্ড গেরিলা হেঁটে গিয়ে তাদের উচ্ছেদ করবে। সহজে কথা না শুনলে ক্যাম্প রেইড করবে। সে ক্ষেত্রে গুলি করে ব্রিজের দিক থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে অন্য দিকে। ল্যান্ড গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের ব্যস্ত রাখবে। আর এদিকে এই সুযোগে উত্তর পাশের দুই পিলারে বিস্ফোরক বেঁধে দিয়ে চলে আসতে হবে। কাজটা খুব সহজ নয়। দ্রুত সেরে ফেলতে হবে। কারণ গোলাগুলির শব্দে সাইলো থেকে মিলিটারি চলে আসতে পারে।

কথামতো অপারেশন শুরু হলো। রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করা হলো। আর এই সুযোগে চ্যাপ্টা লোহার পাত দিয়ে দু'পাশ থেকে বিস্ফোরক বেঁধে দু'টো পিলারে ডেটোনেটর সেট করে সেফটি ফিউজ লাগিয়ে সবাই দ্রুত সরে পড়ে। আলি আহমেদ এবং আমি, আমরা দু'জন থাকলাম। আগুন ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত সরে পড়তে হবে আমাদের। মাত্র দেড় মিনিট সময় লাগবে। এরপর বিস্ফোরণ ঘটবে। এর মধ্যেই সরে পড়তে হবে বিপদমুক্ত স্থানে। আলি আহমেদ ম্যাচ জ্বালে। আমি সেফটি ফিউজে আগুন লাগিয়ে দ্রুত দৌড়ে সরে আসি নিরাপদ দূরত্বে। বড় একটা শিরীষ গাছের পেছনে বসে পড়ি। কানে আঙুল চেপে ধরি। ওদিকে গোলাগুলি চলতে থাকে। এরই মধ্যে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। কানে তালা লাগে। গোটা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ব্রিজটি ভেঙে পড়ে। রাজাকাররা ভয়ে পালিয়ে যায়। কেউ কেউ গুলিবিদ্ধ হয়। কী অবস্থা হলো তা দেখার জন্য ব্রিজের দিকে ছুটছি। আলি আহমেদ কিছুতেই যেতে দেবে না। তার ধারণা দু'একটা রাজাকার লুকিয়েও থাকতে পারে। তারা আমাকে মেরে ফেলবে। আমি তার নিষেধ না শোনায় সে স্টেনগান উঁচিয়ে বলে– 'বিধান, ফের্, নইলে গুলি করে দেব'। এমনিতে সে বিধানদা বলে ডাকে। আজ বিধান বলছে। আমি তার সেন্টিমেন্টের মূল্য বুঝি। কিন্তু আমাকেতো নিশ্চিত হতে হবে যে ব্রিজটা সত্যি ধ্বংস হয়েছে। নইলেতো অপারেশন ব্যর্থ। তাকে বললাম, পাগলামি করো না, আমি দেখে আসছি। কিচ্ছু হবে না আমার। এখানে আর কোনো রাজাকার নেই আমি নিশ্চিত। এরপর দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ি সবাই।

এলাকার লোকজন খুব খুশি। আওয়ামী লীগের নেতা হাশেম সাহেবের বাড়ি খাসি কেটে পরদিন দুপুরে খাবার আয়োজন। ওখানে দু'জন রাজাকারও ছিল। ধরে আনা হয়েছে। একজন বয়স্ক। হাবিবুল্লাহ। বয়স চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ বছর। অন্যজন করিম। বয়স সতের/আঠারো বছর। গেরিলা কমান্ডার ইউসুপ পাকিস্তানি আর্মিতে চাকরি করত। এখন মুক্তিযোদ্ধা। পাক্কা ছয় ফিট লম্বা। ফর্সা। কোঁকড়ানো চুল। ইয়া বড় এক জোড়া কালো গোঁফ। হাতে মার্ক ফোর এর ধা চকচকে একটা বেয়োনেট। প্রায় এক ফিট লম্বা। দেখতে খুবই সুন্দর ওটা। বেয়োনেটটা দিয়ে নিজের কপালে একটা টান মেরে ওদের বলল– পেট ভরে খেয়ে নে জীবনের শেষ খাওয়া। বিকেলেই তোদের জীবনাবসান। আরও বেশি করে মাংস দে ওদের। জন্মের মতো খেয়ে নিক।

কে একজন এসে আরও বেশি করে মাংস দিয়ে গেল ওদের পাতে। যেন সারা জীবনের খাওয়া এখনই খেয়ে নেবে। তারা নিরুত্তর। ভাবাবেগহীন। মাথা নিচু করে খেয়ে যায়। পুতুল নাচের পুতুলের মতো হাত থালা থেকে মুখে ওঠে, আবার মুখ থেকে থালায় নামে। চোখ থালার দিকেই নিবদ্ধ। গলা দিয়ে তাদের ভাতের দলা নামছে কি নামছে না, কে জানে। অন্যের কথা শুনছে কি শুনছে না, তাও বোঝা যায় না। কলের পুতুলের মতো দু'জনেরই শুধু ডান হাত ওঠানামা করছে। আমি গিয়ে ধমক দিয়ে বললাম– এই, কী হচ্ছে, আপনি করছেন কী? ভয় দেখাচ্ছেন কেন? খাবার সময় এ সব বলছেন কেন? ওদের আরাম করে খেতে দিন। তোমরা পেট পুরে খাওতো। আরাম করে খাও।

খাওয়া শেষে বিচার শুরু। বহু লোক হাজির। নানা জনে নানা অভিযোগ বয়ান করে তাদের বিরুদ্ধে। তারা নির্বাক। কোনো প্রতিবাদ করে না। প্রতিরোধ করে না। অভিযোগ খণ্ডন করে না। পাথরের মতো বসে থাকে। যেন পাথরের বিচারসভা। কারো কারো ক্ষোভ আগুনের গোলার মতো ছুঁড়ে দেয় তাদের দিকে। তারা নিশ্চুপ। সিদ্ধান্ত হয় ওদের দু'জনকে মেরে ফেলা হবে। আমি বাঁচাতে চেষ্টা করি। বোঝাতে চেষ্টা করি তারা রাজাকার, ভুল করেছে, মানছি; কিন্তু ওদের মেরে ফেলা ঠিক হবে না। শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেও। নজর রাখো ওদের উপর। ইন্ডিয়ান আর্মি রাজাকারদের খুন করা পছন্দ করে না। কিন্তু পারলাম না। এক বয়স্ক লোক এসে বলল– 'অসম্ভব। আমার বউটাকে এরা দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে। ছিঁড়ে খেয়েছে। এই ছোকরাটাও কয়েকদিন গেছে। এদের বস্‌কেও নিয়ে গেছে। এদের কোনোভাবেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না'। লোকটার দিকে তাকিয়ে তার চোখে প্রতিহিংসা, ঘৃণা আর ক্রোধ দেখতে পেলাম। দেখলাম, চোখে তার প্রতিশোধের ভয়ঙ্কর আগুন। এরপর আর আমি কথা বলি নি।

বিকেলে মাঠে নিয়ে যাওয়া হলো দু'জনকে। খালি গা। চারদিক লোকে লোকারণ্য। কয়েক হাজার বছর আগের কোনো পুরনো বিচারসভা যেন। উৎসুক লোকেরা অপেক্ষা করে আছে শিরশ্ছেদের। বয়স্ক লোকটাকে বলা হলো শুয়ে পড়তে। সে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো শুয়ে পড়ল। কোনো ভাবান্তর হলো না তার মুখের। অন্যজন দুই হাঁটু ভাঁজ করে থুতনি ঠেকিয়ে বসে থাকল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। শমশের বলে একজন সটান শোয়া রাজাকারের বুকে বেয়োনেট ঢুকাতে চেষ্টা করল। পারল না। এলোপাথাড়ি আঘাত করতে লাগল। ঢুকল না। বুক দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকল। পাকিস্তানি আর্মির লোকটা এসে ঝট্ করে তার হাত থেকে বেয়োনেটটা ছিনিয়ে নিয়ে বুকের পাঁজর ভেদ করে ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর ঢুকিয়ে দিল। লোকটা একটুও চিৎকার করল না। কাঁদল না। একটু দাপাদাপিও করল না। নিথর হয়ে গেল। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে কত কম ব্যবধান!

এরপর অন্যজনকে বলল– 'শুয়ে পড়'। সেও সুবোধ বালকের মতো শুয়ে পড়ল মাটিতে। যেন শুয়ে পড়াটাই নিয়ম এখানে। আজ্ঞা পালন করা ছাড়া আর কোনো কর্তব্য নেই। সে জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। কোনো বিকার নেই। রহিম তার পা দু'টো চেপে ধরেছিল। গেরিলাদের ফার্স্ট ইন কমান্ডার মি. ভুঁইয়ার ডান হাতের দু'টো আঙুল নেই। বেয়োনেটটা কেড়ে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তার পিঞ্জর ভেদ করে ঢুকিয়ে দিল সাঁই করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। তারও মৃত্যু ওভাবেই হলো। তবে সে কাঁদল। অসমাপ্ত দীর্ঘজীবন তার সামনে পড়ে, হয়ত সে কারণেই। কিংবা এইমাত্রই সে মৃত্যুর বিভীষিকা অবলোকন করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায়। অথবা মৃত্যুভয়ে। বা অনুশোচনায়। সে কেঁদেছে। ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে। বারবার সে তার মা'র কাছে যেতে চাইছিল দেখা করতে। কাতর অনুনয়-বিনয় করছিল। তবে জীবন ভিক্ষা চায় নি সে। অন্য কোনো কথাও বলে নি।

মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তরে আবেগের স্থান নেই। কর্তব্য টেনে নিয়ে যায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। রাতেই রওনা দিতে হবে সরার চরের উদ্দেশে। সেখানে রেল ব্রিজ ধ্বংস করতে হবে। প্যারা মিলিশিয়া বাহিনীর ক্যাম্প আছে সেখানে। তিন চারশো মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। ক্যাম্পের পতন ঘটানো যাবে না। রাতে ট্রেন থাকে সেনাসহ। রেল ইঞ্জিনটা উড়িয়ে দেয়াই আমাদের কাজ। মিলিটারিরা যাতে করে আর ট্রেনে চলাচল করতে না পারে। রাতের অন্ধকারেই আমরা রওনা দিলাম সরার চরের উদ্দেশে। আর এ সময়েই সেই গগণবিদারী বিকট আওয়াজ। অন্ধকার খান খান হয়ে গেল কামানের গোলার শব্দে আর আগুনের হল্কায়।

রক্তপথিক

এক

ধানক্ষেতে বসন্ত। সাথে তার বউ। বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর। কোল এখনও খালি। সবাই বলে– 'বউটা বাজা'। বসন্ত আর বিয়ে করতে রাজি নয়। এভাবেই যায় যদি যাক কেটে জীবন। তবুও মাঝে মাঝে ভাবে, 'এট্টা বাচ্চাও যদি অইতো'! সন্তানতৃষ্ণা তাকেও মাঝে মাঝে কাবু করে দেয়। বউ নিয়ে বসন্ত রোজ আসে ধানক্ষেতে। ভোরে আসে, সন্ধ্যায় যায়। বিলের ধানক্ষেত নিরাপদ আশ্রয়। বোরো ধানের সবুজ বন। বুক সমান উঁচু। ভেতরে বসে থাকলে কারো দেখার সাধ্য নেই। পালিয়ে থাকার জন্য উত্তম স্থান। মিলিটারিরা এ জায়গার খোঁজ পায় নি এখনও। সমস্যা– সারাদিন শুয়ে-বসে থাকা ভ্যাপসা গরমে। বাতাস ধানক্ষেতের ভেতরে ঢোকে না, উপর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু মাথা বের করার উপায় নেই। তাহলে খুলি উড়ে যাবে।

চারদিকে উঁচু উঁচু ধান। ধানে ফুল এসেছে। কেমন মোটা হয়েছে গাছগুলো। বাড়িতে ধলুও গাভিন। ধলু তার গাই। গাইয়ের বাচ্চা হবে। দুধ হবে। ধান গাছে ফুল। ফুলে কেমন মাতাল গন্ধ। সে ভাবে, 'তার বউটাও যদি গাভিন অইতো'। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ধানগাছ মোটা হয়, ধলু মোটা হয়– তার বউ মোটা হয় না। বউয়ের দিকে তাকায়। বউয়ের গতরের মাতাল গন্ধ টের পায়। বউ বলে ওঠে– 'সারাডা দিন রোদ্দুরে কী যে কষ্ট'? বসন্ত টের পায়, বউয়ের গতরেও ঘামের কেমন মৌ মৌ গন্ধ। ঝাঁঝালো রোদের ধানক্ষেত। গরমে বউ কাপড় রাখতে পারছে না গতরে। সারা বিল জুড়ে কিলবিল করছে মানুষ। শোয়া, আধাশোয়া, বসা। শব্দ নেই। কী জানি, কখন রাজাকার বাহিনী ঢুকে সব দেবে তছনছ করে। বুলেট আর বেয়োনেটে নেবে কলজে উপ্‌ড়ে। নয়ত ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে মেয়েদের। দূর থেকে শুধু ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। উঁচু উঁচু ঢেউ খেলানো। বসন্ত বলে, 'বউ, আমাগো যদি এট্টা পোলা অইতো'। 'হে কপাল কী আর আছে'? –দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দেয় বউ। বউয়ের কপালে ঘাম চিক চিক করে রোদ্দুরে। ভ্যাপসা গরমে গা গুলিয়ে ওঠে। বউয়ের চিবুকে হাত রাখে বসন্ত। মমতায় নুয়ে যায় ঠোঁট নোন্‌তা গালে। চলে নিষ্ফলা জৈবিক খেলা। অবসাদে নুয়ে পড়ে দেহ। ধীরে ঢলে পড়ে সূর্য। নেমে আসে সন্ধ্যা। এবার ঘরে ফেরার পালা। ঘরে ফেরে দিনের নির্বাসিতের দল। উঠে পড়ে বসন্ত। থালা-বাসন-গামলা-বোচকা যা এনেছিল সাথে, তাই নিয়ে চলে গ্রামের দিকে। ঘরে ফেরে বসন্ত। সাথে তার বউ।

সে ছিল যুদ্ধের রাত। রক্তে ছিল আগুন। আগুনে ফুলকি। বাতাসে ধোঁয়া। ধোঁয়ায় গন্ধ। বাংলার আকাশে একরাশ ধোঁয়ার সন্ধ্যা। গা ছম্‌ছম্‌ করা একটি গ্রাম। উজানী। ইতোমধ্যে শেয়াল নেমে গেছে লাশেদের খোঁজে। এক একটা হুঁক্কা হুঁয়া ডাকে থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে ওঠে ধানক্ষেত, নিস্তব্ধ গ্রাম। খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে জমাট অন্ধকার। বুকে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। যারা বেঁচেছিল, নিঃশব্দে ফিরছে। রাতটাই শুধু ঘরে থাকবে। ভোরের আলো ফোটার আগেই আবার আশ্রয় নিতে হবে বিলের ধানক্ষেতে। যেখানে শত্রুর গুলি যাবে না। যাবে না তাদের দৃষ্টি। বেয়োনেটের ধারাল আঘাত। সেখানে। সারাদিন অসহ্য গরম, রোদ-বৃষ্টি সব সহ্য করে আত্মগোপন করে থাকা। মানুষের এটা এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার।

সন্ধে নামার সাথে সাথে সারা গ্রামটা কেমন অন্ধকারে জাপটে ধরে। শেয়াল নামে লাশের খোঁজে। মানুষের ঘরে জ্বলে না আলো। বোমার ভয়। গ্রামটা যেন এক নিভে যাওয়া শ্মশান। সে গ্রামের দিকেই চলছে বসন্ত। গ্রামে ঢোকার মুখে এক স্থানে থমকে দাঁড়ায় বসন্ত। মনে হয় কোথা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে একটা মৃদু কান্নার শব্দ। সতর্ক হয়ে ওঠে বসন্ত। বউ বলে ওঠে, 'কার বাচ্চা য্যান কান্দে মনে অয়'? কিছুক্ষণ কোনো শব্দ আসে না। সতর্ক কান পাতে তারা। কোন্‌ দিক থেকে শব্দটা আসছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। বীভৎস উল্লাসে মেতে ওঠে শেয়াল। ভয়ার্ত চিৎকারে কেঁপে ওঠে বউ। বসন্তের গা ঘেঁষটে দাঁড়ায়। আবার কান্নার শব্দ। এবার বুঝতে পারে শব্দটা কোন্‌দিক থেকে আসছে। পথ থেকে বেঁকে কিছুটা দূরে একটা কুয়োর ধারে নলখাগড়ার বন। মনে হয় সেদিক থেকেই আসছে শব্দটা। বউয়ের উদ্বেগ, 'কার বাচ্চা য্যান

কানতাছে, লও দেহি ব্যাপারডা কী'? পথ ছেড়ে ধানক্ষেত ভেঙে শব্দ যেদিক থেকে এসছিল সেদিকে পা বাড়াল। সন্ধ্যা নেমেছে বেশিক্ষণ না। এরই মধ্যে ঘোর অন্ধকার পড়ে গেছে। কুয়াশাও পড়েছে। এগিয়ে যায় ক্রমশ শব্দের দিকে। শব্দটা স্পষ্ট হয়। বুক ঢিব্ ঢিব্ করতে থাকে বউয়ের। কাছে যেতেই সর্ সর্ করে দৌড়ে গেল কী একটা। বসন্তকে জড়িয়ে ধরে বউ। বসন্ত বলে– 'এট্টা শিয়াল'। কাছে এগিয়ে যায়। কান্নাটা নলঝোপের ভিতরে। সাহসী এগিয়ে যায় বসন্ত। সাথে তার বউ। মরা মায়ের বুকে পড়ে কাঁদছে একটা বাচ্চা। মায়ের রক্তাক্ত স্তন চুষে কান্নায় ভেঙে পড়ে যে শিশুটি, সে বড় একা। হতভাগ্য। এ অন্ধকার হিংসায় উন্মত্ত পৃথবীতে দুর্দিনের যাত্রী। তার কেউ নেই। মা তার গুলিবিদ্ধ। বাপ গেছে যুদ্ধে একটি মানচিত্র পাবার আশায়। শিশুটি নিঃসঙ্গ। চারদিকে ভয়াল অন্ধকার। শেয়ালের ডাক। মশার কামড়। ঝিঁঝিঁর কোরাস। আতঙ্ক। সে কাঁদছে। আর মায়ের স্তন চুষছে। চুষছে দুধ নয়, থাক থাক রক্ত। রক্তের দই। নিথর মায়ের শীতল বুকে শিশুটি কাঁদছে। কথা বলছে না মা। বছরখানেক বয়সের শিশু জানে না, মা তার জীবিত না মৃত। ক্ষিধে তাকে আরও অসহায় করে তোলে। শিশুটি মাকে বোঝে, ক্ষিধে বোঝে; হাসি বোঝে, কান্না বোঝে। আর বোঝে না।

বসে পড়ে বসন্ত। হাত রাখে বউটার গায়। হিম হিম শরীর। ঠেলা দেয়। ন'ড়ে ওঠে। যেন বরফের চাঙ্গড়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে– 'বউটা মইরা গ্যাছে। মনে অয় গুলি লাগছে। রক্তের গন্ধ পাই যে'? ইতোমধ্যে বাচ্চাটাকে বউ তুলে নেয় কোলে। কান্না ভোলাতে চায়। চুমু খায় সোহাগে। বাচ্চাটা ক্ষিধেয় কাঁদে। বউ বুকের আঁচল সরিয়ে মাইটা তুলে দেয় বাচ্চার গালে। 'দুধ আছে কিনা ক্যাডা জানে? শুক্না মাই চুষুক। না বিয়াইলে কি দুধ অয়'? আপন মনে ব'লে যায় বউ। বাচ্চার কান্না কমে আসে। হয়ত দুধ পেয়েওছে কিছু। হয়ত পায় নি।

উদ্বিগ্ন বসন্ত বলে, 'বাচ্চাডারে নয় নিয়া গেলাম, বউডারে কী করি? এহানে এভাবে থাকলে তো শিয়ালে ছিঁইড়া খাইব'? বউ বলে, 'গ্রামে নিয়া যাওয়ারও তো কোনো উপায় নাই। তার চাইতে কুয়ার ধারে কাদা খুঁইচ্যা কবর দিয়া দ্যাও'। বসন্ত ভাবে, 'এ ছাড়া তো কোনো উপায়ও নাই'? গামছাটা প'রে বসন্ত নেমে যায় জলের ধারে। নরম কাদামাটি তুলে একটা গর্ত খুঁড়ে শোয়ায়ে দেয় লাশটা। তারপর তার উপরে আরও খানিকটা কাদা চেপে দেয়। খুব নিচু হয়ে মুখের কাছে চোখ নিয়ে চেষ্টা করছিল চিনতে। অন্ধকারে চিনতে পারে নি। তবে রক্তের গন্ধ পেয়েছে। যেখানটাতে পড়ে ছিল সেখানে মাটিটা ভেজা ছিল। বসন্ত বলে, 'কার বাচ্চা নিয়া যাই, ক্যাডা জানে'? বউ বলে, 'যার বাচ্চা অউক, এ্যাহোন আমার। ভাবো তো, আমরা না আইলে বাচ্চাডার কী অইতো'?

কে কার খোঁজ রাখে যুদ্ধের বাজারে। কে কোথায় যায়, কে কোথায় মরে, কোনো খোঁজ থাকে না। যে যেদিকে পারে সরে যায়। কেউ গ্রাম ছেড়ে, কেউ দেশ ছেড়ে, কেউ জগৎ ছেড়ে। তাই কোন গেরামের কার সন্তান নিয়ে চলল বসন্তের বাজা বউ, তা জানতে পারল না। দুঃখ পেলেও মনে মনে খুশি হয় বউ। 'এদ্দিন পর তার এট্টা বাচ্চা অইছে'। বাচ্চাটা তার নিজেরই। কে জানবে অন্যের বাচ্চা? কে কার খোঁজ রাখে? বুকে চেপে বাচ্চা আবার পথে আসে বউ; বসন্ত। চলে আঁধার ভেঙে। গ্রামের দিকে। সেখানে আলো জ্বেলে দেখে নেবে শিশুকে। দেখতে কেমন? কেমন তার চেহারা। বউয়ের মনে আনন্দ ধরে না। শিশুকে না দেখতে পেলে তার স্বস্তি নেই। তাড়াতাড়ি পা চালায় বাড়ির দিকে। এই অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে, ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে শিশুটির ভবিষ্যৎ কী, তা ভুলেই বসে থাকে বসন্তের সদ্য মা হওয়া বউ। সে এখন মা। পৃথিবী তার হাতের মুঠোয়। আনন্দে আত্মহারা বউ আর কিছুই ভাবতে পারে না।

দুই

তাহের। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একজন যুবক। যুদ্ধে গেছে। ছেলের বয়স তখন সবে এক বছর। মনটাকে শক্ত করে ঘুমন্ত ছেলের কপালে চুমু খেয়ে বিদায় নিয়েছিল। সবসময় পকেটে থাকে তার স্ত্রী ও সন্তানের ছবি। ছবিটা নিয়ে এসেছিল। যুদ্ধে যাবার আগে বের ক'রে দেখে নেয় একবার। মমতায় চুমু খায়। নাকে মুখে ঘষে

ছবিটা। ছেলেটা দেখতে অবিকল তার ছেলেবেলার ছবির মতো। ভাবে– 'খোকা, আমি যদি আর না ফিরি, তবু দুঃখ নেই। তুই যেন বেঁচে থাকিস। তোর মা তোকে দেখেই আমার কষ্ট ভুলবে'। প্রতিদিন যুদ্ধে যাবার আগে ছবিটা দেখে নেয়। যুদ্ধে গিয়েও মাঝে মধ্যে ফাঁক পেলে বের ক'রে দেখে ছবিটা। ভাবে স্ত্রী ও সন্তানের কথা। তারা কেমন আছে, কীভাবে আছে, সে কথা। উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। তারপর আবার ধিক্কারে ভরে ওঠে মন। ভাবে– 'একজন আদর্শ যোদ্ধার মন কখনও এত সংকীর্ণ হওয়া উচিত নয়। সারা দেশের কোটি কোটি মা-ছেলে আজ বিপন্ন যেখানে, সেখানে সে শুধু তার স্ত্রী আর শিশুর কথা ভাবছে কেন'? নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ওঠে। ভাবে– 'আর কখনও তাদের কথা ভাববো না। এতে মন দুর্বল হয়ে ওঠে। আমি মুক্তিযোদ্ধা। যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন সারা দেশের ভাবনাই আমার ভাবনা। ব্যক্তিগত কোনো ভাবনা নেই'। তারপরও মনটা ছটফট করে। অজ্ঞাতে পকেটে চলে যায় হাত। যেখানে সেই ছবিটা আছে, সেখানে। একটু ছুঁয়ে আসে হাত। তাতেও পরম তৃপ্তি।

আজকের যুদ্ধে যাবার সময় মনটা যেন কেমন বেশি হু হু করে উঠেছিল তাহেরের। ভুলভাল হয়ে যাচ্ছিল বারবার। বুটজুতো পায়ে না দিয়ে চটি পরেই রওনা দিয়েছিল প্রথমে। তারপর তৈরি হয়ে বেরুনোর পরে মনে পড়ল স্ত্রী ও সন্তানের ছবিটা আনা হয় নি। স্ত্রী ও সন্তানের কথা মনে পড়ছিল খুব। ভেতরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। ছবিটা বারবার অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল, চুমু খাচ্ছিল। আজকের যুদ্ধটা ছিল ভয়াবহ। তাই হয়ত মনটা কেমন কেমন করছিল। 'যদি আর না ফিরি'? যুদ্ধে যায় তাহের। মনে একরাশ শঙ্কা উদ্বেগ আর কষ্ট।

এক সময় রক্তে ভিজে যায় তার দেহ। জামাটা জবজবে ভেজা। রক্তের কী উষ্ণতা! চোখ মেলে চেয়ে দেখে তাহের। ভাবে– 'খোকা, তোকে আর দেখা হলো না'। কষ্টে পকেট হাতড়ে বের করে আনে ছবিটা। রক্তে ভেজা। খোকার মুখটা দেখতে পেল না। আন্দাজে বুঝে নিল– 'এটা খোকার মুখ; আর এটা তার মায়ের'। চুমু খায় রক্ত-মাখা ছবি। কান্নায় ভেঙে আসে চোখ। বুকে গুলির ব্যথা। ভাবে– 'খোকা, তোকে আর দেখতে পেলাম না'। ঝাপসা হয় তাহেরের চোখ। বিবর্ণ হয় রক্তভেজা ছবি। আবার চুমু খায় রক্তাক্ত কাগজখানা। চেপে ধরে বুকে; যেখানে রক্তের ফোঁয়ারা। যেন তার খোকা বন্ধ করে দেবে উষ্ণ রক্তধারা। এরপর ঝাপসা হয়ে আসে সব। চোখ ভেঙে ঘুম আসে। কতকাল ঘুমায় না যেন। চোখে রাত নামে।

তিন

ঘরে ফেরে বসন্ত। তার বউ। কোলে বাচ্চা। বাচ্চাটা কান্না ভুলেছে। সোহাগে আদরে বুকে চেপে ধরে বউ। বুকের ভেতর সেঁধিয়ে ধরতে চায়। যেন কুড়িয়ে পেয়েছে তার হারানো মানিক। কী করলে যে আরও ভালো লাগে, বোঝে না বউ। স্বামীকে তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালতে বলে। সে আলোয় দেখবে শিশুর মুখ। শিশুটি দেখতে কেমন। আর এক মুহূর্তও সহ্য হয় না বউয়ের। কিন্তু বসন্ত বলে, আলো ধরানো যাবে না। সারা গ্রামে একটাও জ্বলে নি আলো। আলো দেখে বোমা ফেলতে পারে। রাতেই তো বিমান হামলার সুবিধে। দিনে মিলিটারি আসে প্রতিদিনই প্রায়। ঘরবাড়ি পোড়ে না। আগে পুড়িয়েছে। রাজাকাররা দেখল যে না পুড়িয়ে বরং লুট করে নেয়া-ই ভালো। তাই এখন আর পোড়ে না। শুধু খুন করে। রাতে অবশ্য তারা আসে না। আর উজানীর রাতগুলো কেমন আলকাতরার মতো ঘন কালো লেপ্টে থাকা। সেই আলকাতরার গায়ে ফালি কাটে মাংসলোভী শেয়ালের দল। কুটিরে কুটিরে নিস্তব্ধতা। শ্রান্তির নিঃশ্বাস মিইয়ে আসে ক্রমশঃ রাত বাড়ার সাথে সাথে। বসন্ত ভাবে– বউটাকে চিনতে পারল না। আর চেনা যাবে না। বরং ভোর হলে কবরের কাদায় কিছু হেলেঞ্চা শাখ, কলমিলতা পুঁতে আসবে। এ ছাড়া কী-ই-বা করার আছে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে যায়। ঘুম নেই বসন্তের বউয়ের। তার চোখে আলো জ্বলে। আলো জ্বলে হৃদয়ে। সে আলোয় দেখতে পায় শিশুকে। সন্তানকে। আর সে হলো মা। মায়ের কাছে সন্তানের আপন পর ভেদ নাই। এ শিশু তার নিজের। কী যে ভালো লাগে ভাবতে কথাটা। কিন্তু শিশুর মুখটাই দেখা হয় নি এখনও। পরিচয় শুধু এটুকুই যে, সে তার

সন্তান। শিশুটি ঘুমায়। জড়িয়ে চুমু খায়। তৃপ্তি মেটে না। ভাবে, রাত ভোর হয় না কেন? আলো ফোটে না কেন?

নির্ঘুম কেটে যায় রাত। ভোর হ'তে বাকি নেই। বোঝা যায়। উত্তরে জমেছে মেঘ। ঘন কালো। আরও কালো হয়ে যায় যেন রাতটা। বিজলি চমকায় থেকে থেকে। সে আলোয় শিশুকে দেখে নেয় বউ। কী সুন্দর! কেমন ফুটফুটে। পদ্মের মতো। মমতায় চুমু খায়। জেগে ওঠে ঘুমন্ত শিশু। চোখ মেলে তাকায়। বিজলিতে চোখ ঝলসায়। বাজে পড়ে। বোমা ভেবে ভুল হয়। ছেলেটা আঁৎকে উঠে একটু কাঁদে। মা তার বুকের আঁচল সরায়। তার বুকের দুধ কেউ খায় নি এতকাল। আজ তাই কী যে আনন্দ। মাইটা ধরে তুলে দেবে শিশুর মুখে। চম্‌কে যায়। তার মাইয়ে লেগে আছে রক্ত। বুঝতে পারার আগেই নিভে যায় বিজলির আলো। আবার চমকায়। এক লহমায় দেখে নেয় রক্ত। শিশুর দু'হাতে রক্ত। গায়ে-মুখে রক্ত। বুঝতে বাকি থাকে না– শিশুর রক্তে রঞ্জিত তার মাই। আর শিশু রঞ্জিত তার মায়ের বুকের রক্তে। ভাবে– এক পলক দেখে তৃষ্ণা মেটে না। ভোর হোক। আলো ফুটুক। চোখ ভ'রে দেখবে তার শিশুকে, ভবিষ্যৎকে। সুন্দর আগামীকে। এই মেঘের আলোয় বড় বেশি দেখা যায় না। গভীর মমতায় বুকে চেপে রাখে শিশুকে একটি ভোরের আশায়। এ শিশু তার আঁধারে পাওয়া মানিক। ভোরের আলোয় তাকে চোখ ভরে দেখবে, বুক ভ'রে সোহাগ করবে। তার পক্ষে একটি মুহূর্তও আর সহ্য করা কঠিন। এখনই ভোর হয় না কেন? আলো ফোটে না কেন? গভীরভাবে শিশুকে জড়িয়ে মা ভাবে। ভাবতে থাকে। রক্তের রঙ মেখে সূর্য উঠবে পুব আকাশে।

চমকে ওঠে ওরা। বাইরে ধুপ্‌ধাপ্‌ বুটের আওয়াজ। অনেক লোকের পদশব্দ। বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। ওরা কারা? মিলিটারি না মুক্তিফৌজ? তবে কি সব শেষ হয়ে যাবে আজ? বুকে চেপে ধরে শিশুকে। সে যে রক্তপথিক!

লাশের নদী

সবে তখন সন্ধে। বাতাস প্রকম্পিত করে উন্মাদ শব্দ ধায় দিগ্বিদিক। দিশেহারা বাতাস গুলিবিদ্ধ। বাস্তবের আকাশে কোনো মেঘ নেই তবু বিজলি চমকায় ঘন ঘন। প্রকৃতপক্ষে তা মেশিনগানের আগুন অন্ধকার ঠিক্‌রে বেরয়। নৈঃশব্দের বুকে আতঙ্কের বীজ বোনে। আর অন্ধকারের বুকে আলোর আলপনা আঁকে। চোখে চমক লাগায়। আতঙ্ক মূর্তি হয়ে অট্টহাসি হাসে। ক্রূর এবং ভয়াল সে সময়টা জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে পেন্ডুলামের মতো দোলে। সময়ও গুলিবিদ্ধ হয়। যেহেতু প্রাণ নেই সময় তাই কাৎরায় না। মানুষের মতো ছটফট করে না। সময় স্থির কিংবা অদৃশ্য চলে। সাতচল্লিশ কিংবা তারও আগে থেকে শুরু করে বায়ান্ন কিংবা ঊনসত্তর পরিভ্রমণ করে একাত্তরে এসে থামে। বর্বরতার সাক্ষী হয়। যদিও সময় মৃত অদৃশ্য বিদেহী আত্মার মতো। তবু সাক্ষী হয়।

গলিত একটা লাশকে আলিঙ্গন করে ভেসে রইল ডেভিড। ঠিক আলিঙ্গন নয়, জড়িয়ে। আঁকড়ে ধরে থাকল বন্ধুর মতো পরম নির্ভরতায়। লাশও বন্ধু হয় কখনও সখনও। ওই লাশটাই যেন তার আশ্রয়। শেষ ভরসা। নাকে মুখে হাতে মাখনের মতো না বলে পুঁজের মতো লাগছে লাশের গলিত শরীর বলাই ভালো। দুর্গন্ধ ভয়ঙ্কর। নরক যেন। পেটের নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসতে চায় লাফ মেরে। ঘৃণা কিংবা ভয় এখানে তুচ্ছ। ভেসে থাকল গলিত লাশের ক্লেদাক্ত পানিতে। লাশকে আঁকড়ে নিজেই লাশ হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা কিংবা অপচেষ্টা। তাকেও লাশ ভেবে ঠোকর কাটে দু'একটা মাছ। গুলির ভয় তুচ্ছ করে মাছ করে খাদ্যের তালাশ। শতশত লাশের মধ্যে একমাত্র ডেভিডের দেহেই প্রাণ আছে। আর সব নিষ্প্রাণ। মৃত। গলিত। এ তত্ত্ব নিরর্থক মাছেদের কাছে। সবাইকেই লাশ ভাবে তারা। পাকসেনাদের কাছে যেমন সব বাঙালিই শত্রু। ব্লাডি।

আশ্বিন কার্তিক মাসে পানিতে পচন লাগলে বিলের ধানক্ষেতে পোটকা মাছ যেমন পচে ফুলে ভাসতে থাকে, সলধা নদীতে মানুষগুলো তেমনি ভাসছে। একটা দু'টো নয়, শয়ে শয়ে নয়, হাজারে হাজার। মানুষগুলো নয়, মানুষের শবগুলো। এ যেন লাশের মিছিল। শ্লোগানবিহীন নিঃশব্দ মিছিল। লাশের মিছিলে প্রতিদিন শামিল হয় আরও আরও লাশ। মাইলের পর মাইল জুড়ে বাতাসে পচা লাশের গন্ধ। শুটকি মাছের খোলার পাশ দিয়ে তবু হাঁটা যায়, এ নদীর পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না। মানুষপচা গন্ধে নদী-তীরবর্তী এলাকা বীভৎস। লাশগুলো বিকৃত। গলিত, অর্ধ-গলিত এ লাশগুলো খুবলে খুবলে খাচ্ছে মাছ। শেয়াল, শকুন, কুকুর। যে যেমন পারছে। রাতে কিংবা প্রত্যক্ষ দিবালোকে। ভেসে থাকা লাশের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরাম করে খাচ্ছে কুকুর আর শেয়াল। নদী জুড়ে পতঙ্গের মতো উড়ছে শকুন। ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে মৃতের পচা-গলা শরীর। উড়ছে উল্লাসে। কখনও বিশ্রাম নিচ্ছে কিছুক্ষণ গাছের ডালে। এখানে কোনো মানুষ নেই। যারা ছিল, সবাই লাশ। যারা লাশ হতে পারে নি, তারা পালিয়েছে জন্মের মতো। 'এই মৃত্যু-উপত্যকা' তাদের দেশ নয়।

আলবার্ট ফিলিপ ব্যাপারীর বড় ছেলে ডেভিড। পাকিস্তানি আর্মির নজর পড়ল তার উপর। তাগড়াই যুবক। বুদ্ধি আছে। সাহস আছে। লেখাপড়াও জানে কিছুটা। তাকেই তাদের দরকার। হৃদয়টা শুধু নির্দয় আর নির্মম হওয়া চাই। এখানে কোনো সহানুভূতির জায়গা নেই, হতে হবে নিষ্ঠুর আর পাষণ্ড। কাজটা কঠিন কিন্তু জটিল নয়। মুক্তিবাহিনী আর হিন্দু বাড়িগুলো চিনিয়ে দেয়া। পথ-ঘাট দেখিয়ে তাদের সাহায্য করা। আর সুন্দরী মেয়েদের খোঁজ দেয়া। তাতে তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণ বাঁচবে। কঠিন সঙ্কটের মুখে ডেভিড। সেধে সেধে কেউটের লেজে পা। দাসত্ব, নয় মৃত্যু– বেছে নিতে হবে একটা। কঠিন পরীক্ষা। একই বৃন্তে অনেক কুসুম। মা-বাবা-ভাই-বোন। একার জন্যে সব হারাতে হবে। প্রাণ যাবে নিজেরও। হয় দেশ, নয় পরিবার। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই দেশদ্রোহী। বন্ধু হয়েও শত্রুর আচরণ। মাথার ভেতর কেমন এক জটিল প্রতিক্রিয়া হয় তার। মগজের ভাঁজে ভাঁজে কিলবিল কেঁচো। অজস্র চিন্তার ডিগবাজি। মাথার ভেতর ঘুণপোকার বাস। শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে আগুন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

যুদ্ধ শুধু দেশে নয়, ঘরেও। বাইরে নয়, অন্তরেও। ডেভিডের মনে যুদ্ধ। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় অন্তর। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। দ্বন্দ্ব বাবা-মা'র। মা'র বারণ রাজি হতে। বাবার সম্মতি। অশান্তি চরম।

মা বলেন– কী ভেবেছিস্ তুই, কাজ শেষে তোকে ছেড়ে দেবে ওই পশুরা? কক্ষণও না।

বাবা বলেন– আশ্বাস যখন দিয়েছে, আশা তো করা যায়?

– আশ্বাসের কোনো দাম নাই ওই শয়তানদের কাছে।

– মরতে তো হবেই। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? তুই রাজি হ'।

কোনোভাবেই মন স্থির করতে পারে না ডেভিড। টু বি অর নট টু বি'র দ্বন্দ্ব। এ যেন শাঁখের করাত।

ছোট ভাই নাবালক। বোনেরা সামনে আসে নি। তীরবিদ্ধ কপোতীর মতো কাঁপছে ভিতর ঘরে। বাইরে অপেক্ষমাণ মূর্তিমান যমদূত। পাকসেনা। শেয়ালের চেয়ে ধূর্ত। হায়েনার চেয়ে হিংস্র। চিতার চেয়ে ক্ষিপ্র। আর জানোয়ারের চেয়ে নির্দয়। নিষ্ঠুর। উপায় কী? বাঁচার তাগিদেই রাজি হওয়া।

সারা গ্রাম যেন শ্মশান। আগুন নিভে গেলেও ধোঁয়া আর ছাই থাকে। আর থাকে ঘর-পোড়া ঘ্রাণ। দিনের বিভীষিকা জড়িয়ে থাকে রাতের শরীরে। প্রতিদিন পাকসেনা এক এক এলাকায় ঢোকে, লুট করে আর পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সব। সোনা-দানা-টাকা-পয়সা যা পায় তুলে নেয়। জীবিত যাদের ধরতে পারে পিঠ বেঁধে নিয়ে আসে সলধার পাড়ে। কারো মুখে আতঙ্ক। চোখে মৃত্যুর বিভীষিকা। কেউ আর্তনাদ করে ওঠে। কেঁদে ওঠে হাউমাউ। কেউ ঈশ্বরকে ডাকে প্রাণপণে। বধির ঈশ্বর শোনে না তাদের আর্তি। নির্বিকার। স্কুলের সমাবেশের মতো সারিবদ্ধ দাঁড় করায়। যেন তখনি গাইতে বলবে 'পাক সার জমিন সাদ বাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ . . .'। কিন্তু গাইতে বলে না। সমাবেশের সারিটা দেখে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি হাসে। উর্দুতে কিছু একটা বলে। নিয়ামত খানের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়– ফায়ার। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে বন্দুক। গুলি ঝাঁঝরা করে দেয় বুক। মাটির পুতুলের মতো কাৎ হয়ে পড়ে যায় গোটা সারি। এক গুলিতে দশ/বারো জন খতম। গুলি খেয়েও যদি কেউ কাৎরায় তাকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে। এরপর লাথি মেরে লাশগুলো ফেলে দেয় সলধার পানিতে। সলধা যেন মা-জননী। সন্তানকে টেনে নেয় বুকে।

বোতলা ঘাসের মতো আতঙ্ক গজিয়ে ওঠে সারা গ্রামে। তার সামনেই সেদিন পাকসেনারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল স্কুলের দিদিমণিকে। কাঁটাতারে বেঁধা কাপড়ের মতো ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেল দিদিমণির শাড়ি-ব্লাউজ। পিশাচও দেখতে লজ্জা পায় সে দৃশ্য। সে বাধা দিতে পারে নি। কিচ্ছু বলতে পারে নি। সে ক্রীতদাসমাত্র। হুকুম তামিল করাই তার একমাত্র কাজ। দিদিমণি পড়াচ্ছিলেন– 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?' আহা, প্রিয় দিদিমণি। হেডমাস্টার সত্যেনবাবুর ঘরে ঢুকে সোজা গুলি ছুঁড়ে দিল তাঁর বুকে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিপরা সত্যেনবাবু যেন হোলিখেলায় ক্লান্ত এক তরুণ। ধপ্ করে পড়ে গেলেন মেঝে। পড়ে রইলেন মাটিতে। সাদা পাঞ্জাবিটা রক্তে লাল। ডেভিড শুধু সাক্ষীই নয় এ পাপযজ্ঞের, সে বিভীষণ।

বোটের চিপ নিয়ামত খানের হুকুম তামিল করাই ডেভিডের কাজ। কালকের অপারেশনের তালিকা তৈরি হয় আজকের রাতে। তারপর হুইস্কির গেলাসে চাপা পড়ে টেবিলের পাশে। সিগারেটের আগুনে পুড়ে ছাই হয় পরের সন্ধ্যায়। আবার নতুন তালিকা। আজকের টার্গেট অবিনাশ চক্রবর্তী। হাইস্কুলের শিক্ষক। দেশপ্রেমী। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। এলাকার যুবকদের যিনি উৎসাহিত করেন যুদ্ধে যেতে। ভোর থাকতেই অপারেশন শুরু। ডেভিডের জীবন-মরণ সমস্যা। অবিনাশবাবুর ছোটছেলে অনিমেষ ডেভিডের বন্ধু। মেয়ে অদিতিকে সে ভালোবাসে। ডেভিডের হাত-পা বাঁধা। নিজেরই নিজের কলজেটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় ক্ষোভে দুঃখে যন্ত্রণায়। সে জানে, করার কিচ্ছু নেই তার। সে এখন অন্যের হাতের দাবার ঘুঁটি। স্থির ছবির মতো চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিচ্ছু করার নেই তার। বড় বিপন্ন সে। সে যেন পুড়তে থাকা অসহায় এক সলতে। তারই

পায়ের তলায় পিষ্ট অদিতির প্রেম। তার জীবনের বিনিময়ে যদি বাঁচানো যেত তাদের, সে আত্মাহুতি দিত। কিন্তু একই সুতোয় গাঁথা তার এবং তার পরিবারের সবার জীবন। সে অসহায়।

ভারি বুটের শব্দে খানখান ভোরের বাতাস। বিষণ্ন বিবর্ণ সকালের আলো। গাছে গাছে শঙ্কিত পাখিরা। উঠোনের মুরগিগুলো ছুটোছুটি করে দিগ্বিদিক। ওরাও যেন টের পেয়ে গেছে সর্বনাশের। চিৎকার চেঁচামেচিতে হুড়মুড় ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন অবিনাশবাবু। ছেলে অনিমেষ। একমাত্র মেয়ে অদিতি। বড়ছেলে অমিতেশ যুদ্ধে। উঠোনে পাকসেনা। সাথে ডেভিড। চোরের মতো দাঁড়িয়ে পেছনে। নীরব। নীরবতা ছাড়া আর কোনো প্রশ্রয় থাকে না এখানে।

কটূ কথা যার মুখে কেউ কখনও শোনে নি, তার মুখে বেরিয়ে আসে– নিমকহারাম!

দাঁত কটমট করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিচ্ছু করার থাকে না অবিনাশবাবুর। কলে-পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করেন। কাঁপতে থাকেন। কোনো কথা যোগায় না মুখে।

ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে অনিমেষ– ডেভিড, তুই?

তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে ডেভিডের। নিজেই নিজের শত্রু যেন সে।

পায়ের নিচের মাটি সরে সরে যায় অদিতির। বিস্ময়াহত হরিণীর মতো অদিতির কণ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণ– হায় ঈশ্বর!

চিৎকার চেঁচামেচি বৃথা। প্রতিবাদ প্রতিরোধের চেষ্টা বৃথা। আগুনের কাছে খড়ের মিনতি অর্থহীন। হায়েনার কাছে হরিণার প্রাণভিক্ষা নিষ্ফল আবেদনমাত্র। চোখের জলের মূল্য এখানে একটিমাত্র বুলেট। আর অদিতি! সে তো হোমের আগুনে এক পশলা ঘি।

জ্বলন্ত অগ্নিকূণ্ডে নিক্ষিপ্ত ডেভিড যেন এক টুকরো লোহা। পুড়ে ছাই হয় না। আগুন হয়ে জ্বলে। সে নিরুপায়। তার কষ্ট কেউ বোঝে না। বোঝা যায়ও না। সে যে নির্দোষ, সে যে সময়ের সৃষ্টি, সে যে নিমিত্তমাত্র– কী করে তা বোঝাবে অদিতিকে? অবিনাশবাবুকে? কাউকে? সে নির্দয় নয়, বেইমান নয়। সে নিয়তির খেলার পুতুল। ভেতরটা ভস্ম হয়ে যায়। আর জ্বলে অসহ্য যন্ত্রণায়।

হিন্দু, মুসলিম আর খ্রিষ্টানের রক্তে লাল সলধার পানি। সলধা নদীর পানি লাল হয় আরেকবার। আরও একবার বাতাস প্রকম্পিত হয় মেশিনগানের গুলিতে। লাশের মিছিলে যোগ হয় আরও কয়েকটা লাশ। অদিতির ভাগ্য পাকসেনার হাতে। সেনা-ক্যাম্পে স্থান হয় তার। মৃত্যুর অতীত বিভীষিকা নিয়ে বেঁচে থাকে মৃত্যু নেই বলে। ডেভিড অদিতি একই বোটে। দূরত্ব অথচ পাথার পাথার। অদিতি এখন দূরের নক্ষত্র। দৃষ্টির বাইরে। 'শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ' অদিতির শরীর। বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে খানখান হয়ে যায় অদিতির বিশ্বে। ডেভিড যেখানে এক নরকের কীট। বেইমান। বিশ্বাসঘাতক। চোরাস্রোতে ঘুরপাক খায় জীবন। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর বেঁচে থাকা।

পাক আর্মির কাজ শেষ এ অঞ্চলে। তারা নিশ্চিত হয়েছে যে আর কেউ বেঁচে নেই এখানে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দল নাকি ঢুকে পড়েছে গোপালগঞ্জে। ওখান থেকে খবর এসেছে। কাল ভোরে রওনা দেবে গোপালগঞ্জের দিকে। আজ উল্লাসের রাত। মক্ষীরানি অদিতি। এ অঞ্চলে একমাত্র ডেভিডের পরিবারই জীবিত রয়েছে। তার দুই বোন ক্লারা আর ক্যাথরিন। ক্লারা কলেজে। ক্যাথরিন ক্লাস টেন। তারা সসম্মানেই আছে। কারণ, ডেভিড। তাদের গাইড। কাল তাকে মুক্তি দেয়ার কথা। এতদিন আর্মির গাইড হিসেবে থাকলেও তাকে চোখে চোখে রাখা হতো যাতে পালিয়ে না যায়। আজও রয়েছে। দু'জন বন্দুকধারী তার প্রহরায় থাকে সবসময়। ব্লাডি বাঙালিকে বিশ্বাস নেই।

একটু আগেই, বাথরুমে যাবার সময়, সে জানতে পেরেছে, এখান থেকে আর্মি চলে যাবে কাল। এও শুনতে পেয়েছে, তাকে ছাড়া হবে না। গুলি করে ফেলে যাবে এই সলধাতেই। ডেভিড ছিল দাবার শেষ ঘুঁটি। প্রতিশ্রুতি প্রতারণা মাত্র। সহানুভূতি বলে কোনো কথা নেই পাকসেনাদের অভিধানে। তার দুই বোনকে তুলে

নিয়ে যাবে আর্মিরা তাদের ক্যাম্পে। এ কথা শোনার পর থেকেই খাঁচায় আগুনলাগা পাখির মতো ছটফট করছে ডেভিড। মগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হয় চারদিক। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে থাকে আপাদমস্তক– শালার নিমকহারামির বাচ্চারা? পারলে উড়িয়ে দিত তাদের বোটটা। জ্বালিয়ে দিত। কিন্তু সে সুযোগ তার নেই। নেই সামর্থ্যও। সে এখন নিজেই নিজের ফাঁসুড়ে। নিজেই এক বোমা যেন বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। সে তাই পালাবার পথ খোঁজে। পালাবার পথ নেই। সব পথ রুদ্ধ এখানে। দু'জন সব সময় পাহারায় রাখে তাকে। মৃত্যুই একমাত্র সত্য এখন।

ডেভিডের পরিবারে ভাঙন। অশান্তি লেগেই আছে বাবা-মা'র।

– ডেভিড আর ফিরবে না। ফিরতে দেবে না ওকে। চলো পালাই আমরা।

– কী যে বলো? বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে পালাব? বললেই হলো? তা ছাড়া আমরা খ্রিষ্টান।

– খ্রিষ্টান মুসলমান বলে ওদের কাছে কিছু নাই। খ্রিষ্টান হই আর মুসলমান হই– আমরা বাঙালি। আর এই পরিচয়টাই ওদের কাছে মুখ্য। আর কেউ বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ এ গ্রামে।

– খারাপ কিছু হলে, এতদিনে হতো।

– কী আর খারাপ হবে এর চেয়ে?

– আমাদের তো কোনো সমস্যা হয় নাই?

বাবা হাল ছাড়ার পাত্র নয়। কী করার আছে ক্যাথরিন ক্লারা বুঝতে পারে না। নাবালক ভাইটা সবার মুখের দিকে তাকায়। সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝে না। শুধু বোঝে– ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ বুঝি।

সলধার পানি আর লাল নেই এখন। আগে লাল ছিল। এখন কালো। সব লাশ পচে গেছে। এখন আর রক্তের চিহ্ন নেই। সন্ধে ঘনিয়ে এলো। সূর্য ডুববে। আজ আবার সলধার পানি লাল। রক্তে নয়। ডুবুডুবু সূর্যের আভায়। সূর্যটাও গুলিবিদ্ধ যেন। সূর্যের রক্তে লাল সলধার পানি। একটু পরেই অন্ধকার হবে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সূর্য যখন ডুবে গেছে, চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ডেভিড খেয়াল করল– বোটের ডেকের উপর কাছে তার মাত্র একজন প্রহরী। কিছুটা আনমনা। অন্যজন বাথরুমে। এই-ই সুযোগ। পেছন থেকে লাথি মেরে তাকে পানিতে ফেলে দিয়ে সে লাফ দিয়ে পড়ে গেল নদীতে। আর্মিটা সাঁতার জানে না। বালিভর্তি বস্তার মতো টুপ্ করে ডুবে গেল পানিতে। আর ডেভিড এক ডুবে যতদূর পারা যায় গিয়ে ভেসে উঠল। আবার ডুব দিল। আবার ভাসল। যেন এক আজব শুশুক। টের পেয়ে বোট থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে লাগল সাথে সাথে। খানখান হয়ে যায় নদীর নিস্তব্ধতা। স্রোতও যেন থমকে দাঁড়ায় ভয়ে। চিৎকার করে ছুটে পালায় মাংসভুক পিশাচেরা দূরে।

লাশের গায়ে গুলির মিছিল। ফুটো ফুটো হচ্ছে লাশের শরীর। ছড়ুড়ু ছড়ুড়ু শব্দে কেঁপে ওঠে সলধার পানি। কেঁপে ওঠে যেন সলধার লাশও। কেঁপে ওঠে রাতের অন্ধকার। শেয়াল, শকুন, কুকুর। কোনো মানুষ কাঁপে না। এ অঞ্চল জনহীন। কেঁপে ওঠার মতো আর কোনো মানুষ নেই অবশিষ্ট। বোটে অদিতি আর পানিতে ডেভিড। দু'জনই চেতনারহিত। তখনই গুলি বন্ধ হয় যখন আর্মি নিশ্চিত হয় যে ডেভিড বেঁচে নেই। পরিকল্পনা ছিল কাল সকালে ডেভিডের রক্তে সলধার পানি রাঙিয়ে তার বোনদের খোঁজে যাবে আর্মি। ডেভিড ছিল তাদের তুরুপের তাস। ভাগ্যের কী খেলা, কয়েক ঘণ্টা আগেই সে সুযোগ নিজেই এসে ধরা দেয় হাতের মুঠোয়। আর কালক্ষেপণ করা বৃথা মনে করে তারা রওনা হয় ডেভিডের বাড়ির দিকে। জেগে ওঠে পশুত্ব। মেতে ওঠে পৈশাচিক উল্লাসে। আজ রাত উন্মাদনার। সলধার শেষ রাত। লাশের নদীর শেষ রাত। বিজয়ের রাত। পানপাত্র আর হুইস্কির বোতলের ঝনঝনানি ডুবিয়ে দেয় অদিতির চুড়ির রিনিরিনি আওয়াজ। কিংবা কান্নার সুর।

আচমকা ছন্দপতন। বিনামেঘে বজ্রপাত। নেশা জমতে না জমতেই বিকট শব্দে দাউদাউ জ্বলে উঠল গোটা বোট। এই প্রথম আলোকিত হয়ে উঠল গোটা নদীটা। যেন হেসে উঠল সকল লাশ। ডেভিড স্তম্ভিত। সে যেন ভুলে গেছে লাশের ভিড়ে সে একা জীবন্ত লাশ। ব্লাডি বাঙালিকে বিশ্বাস নেই।

আধুলি

পয়সাটা পড়ল, কিন্তু ঠুন্ করে কোনো শব্দ হলো না। কারণ, ওটা কোনো ভিক্ষুকের থালায় পড়ে নি। দু'টো থালার মাঝখানে নো-ম্যান্স ল্যান্ডে পড়েছে। বালির মধ্যে। ওখানে পড়ায় তা ধুলোর মধ্যে নাক উঁচিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। গা ঢাকা দেয়ার কারণ সীমান্তরক্ষী। দু'দিকের দুই ভিক্ষুকের হস্তক্ষেপ। যে কেউ লুফে নিতে পারে। তাই লুকিয়ে থাকা। পাসপোর্টবিহীন নাগরিকের মতো সীমান্তরক্ষীর হাত থেকে আত্মগোপন। পথিক ছুঁড়ে মেরে দিয়ে চলে গেছে। তার দায় শেষ। কিন্তু একটা সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে ওতে। প্রশ্নটা এই– পয়সাটা কার? গরিব উল্লাহর নাকি ফকির উল্লাহর? গরিব উল্লাহ ভাবছে, পয়সাটা তাকে দিয়েছে। ফকির উল্লাহ ভাবছে, ওটা তাকেই দিয়েছে। দু'জনেরই ধারণা ওটা তার হক পাওনা। পয়সাটা একটা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায়।

ওটা একটা আধুলি। চকচকে। একদিকে শাপলা ফুল। অন্যদিকে আনারস, কলা, মুরগি ও ইলিশ। মাছ, মাংস, ফল, সব্জি– সবই আছে পয়সাটার মধ্যে। তাই ওটার গুরুত্ব অপরিসীম। এই আধুলিটা একটা যুদ্ধের সূচনা করে। অর্থই সকল অনর্থের মূল– এই প্রবাদটা এখানে সত্য প্রমাণিত হয়। আকাশ ফুঁড়ে আধুলিটা পৃথিবীতে পড়ল। দু'টো কঙ্কাল সহসা উঠে দাঁড়ায় এবং একে অন্যকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। কঙ্কাল দু'টোর মধ্যে ঠক্ঠক্ শব্দ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয় না; কারণ, দু'জনেরই হাড়ের উপর কিঞ্চিৎ মাংস জড়িয়ে রয়েছে। এতই রুগ্ণ, দুর্বল আর শীর্ণ যে প্রবল আক্রোশের আক্রমণ হঠাৎ কোলাকুলিতে পরিণত হয়। যে কেউ দেখলে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ভাববে তারা কোলাকুলি করছে। ঈদের কোলাকুলি। ঈদ মোবাররক। প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতিটা ঠিক উল্টো। তারা মারামারি করছে। মারামারি করছে নো-ম্যান্স ল্যান্ডে পড়ে থাকা আধুলিটার জন্যে। আনারস, কলা, মুরগি, ইলিশ মাছ আর শাপলা ফুলের জন্য। গরিব উল্লাহ ভাবে পয়সাটা তার থালার দিকে ছুঁড়ে মারা হয়েছে। ফকির উল্লাহ ভাবে তার থালার দিকে। যার যার অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেষ্ট। অধিকার সচেতনতায় তারা বেশ সক্রিয়। অতএব, যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই।

কিন্তু সমস্যাটা অন্যখানে। বহুদূর পাড়ি দিয়ে সীমান্তে পৌঁছানো সৈনিকের মতো তাদের সামর্থ্য নিঃশেষিত। দুই পক্ষই ক্ষীণবল। হতবল। এতই যে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরেই রয়েছে। আর কিছু করছে না। এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই। কারোরই অন্যজনকে চড়-থাপ্পর, কিংবা কিল-ঘুসি মারার সামর্থ্য নেই। দু'জনই হাঁপানির রোগী। সারাবেলা খুক্ খুক কাশে। এক কথা বলতে তিনবার দম ফেলে। এটা যে একটা অসুখ বা এর যে চিকিৎসা প্রয়োজন, তা তাদের মাথায় আসে না। পায়খানা পেচ্ছাবের মতো নৈমিত্তিক ব্যাপার মনে হয়। হাঁপিয়ে উঠেছে দু'জনই। দম নিচ্ছে, দম ফেলছে। যেন এই দমই শেষ দম দু'জনের। দীর্ঘ অদর্শনের পর যেন দুই বন্ধুর দেখা, এমনিভাবে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। এ কারণে তাদের মধ্যস্থতা করার জন্যও কেউ এগিয়ে আসে না। যুদ্ধ থামাবার চেষ্টাও করে না কেউ। বস্তুত তারা একে অপরের বন্ধু নয়, শত্রু। আগে বন্ধু ছিল। আধুলি ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই তারা একে অপরের শত্রু বনে যায়। অথচ তারা দু'জনই শোষিত। দু'জনই বঞ্চিত। দু'জনই একই শ্রেণির।

সামনে দু'টো ভাঙা থালা নিয়ে ফুলতলা বাসস্ট্যান্ডে পাশাপাশি বসে ছিল দু'জন ভিক্ষুক গরিব উল্লাহ আর ফকির উল্লাহ। হাড় জিরজিরে খালি গা। পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি। একজন পথচারী একটা আধুলি ছুঁড়ে মেরে চলে যায়। পথিকের ছুঁড়ে মারা আধুলিটা কার উদ্দেশ্যে কেউ জানে না। দু'জনই হুমড়ি খেয়ে পড়ে পয়সাটার উপর। পয়সাটা ডুব মেরেছে বালির তলে। কেউ ছাড়তে রাজি নয় অধিকার। আধুলি ফেলে একে অপরকে

ধরে। দাঁড়িয়ে দু'জন দু'জনকে মারার জন্য উদ্ধত হয়। একে অপরকে জাপটে ধরে। এর বেশি কিছু করতে পারে না। দম শেষ হলে ধপাস করে দু'জনই বসে পড়ে। কিন্তু জড়িয়ে ধরেই থাকে। যেন যুদ্ধ শেষ হয় নি। তবে নির্বিকার। ভাবলেশহীন। দুর্ভিক্ষের ভাস্কর্য। পাথর। তাদের শেষ শক্তিবিন্দু যেন খরচ হয়ে গেছে। পয়সাটা খোঁজারও কোনো শক্তি নেই তাদের। কতকাল এ ভাবে থাকবে নিজেরাও জানে না তা। শত্রুতার আলিঙ্গন তাই প্রগাঢ় হয়।

কাছেই একটা বস্তিতে থাকে গরিব উল্লাহ আর ফকির উল্লাহ। প্রতিবেশী। 'কেবল তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'। এই ঝগড়া গালাগালি, এই পীরিত গলাগলি। এই শত্রু, এই মিত্র। হাসপাতালে জন্ম ও মৃত্যুর সহাবস্থানের মতো শান্তি ও অশান্তির সহাবস্থান। তাদের একজনের সম্পর্কে বললেই আরেকজন সম্পর্কে বলা হয়ে যায়, কারণ দু'জনের জীবন, জীবিকা, ঘর, সংসার, সন্তান, স্ত্রী– বেঁচে থাকা, একেবারে এক। তিন মেয়ে এক ছেলে এক স্ত্রী। দু'জনেরই বড় মেয়ে সোমত্ত। কাগজ কুড়ায়। টুকরো টাকরা ফুর্তিও কুড়ায়। ফাউ দু'এক পয়সা পেলে আইসক্রিম খায়, ফুসকা খায়। কখনও স্নো-পাউডার-লিপিস্টিক উপহার পায়। বউরা পরের বাসায় ঝি-গিরি করে। চুরির অভ্যেস তাদের নেই। তবে মাঝে মধ্যে আলুটা মুলোটা কলাটা আঁচলের তলে কোঁচরে করে লুকিয়ে নিয়ে আসে। তাতে তেমন কোনো দোষ নেই। সংসারে কিছুটা সাশ্রয় হয়। বাজারের পাশে রাস্তার খাদে বাঁশের খুঁটি চটের বস্তা তাঁবু টাঙিয়ে ঘর। ছায়া হয়। রোদ-বৃষ্টি মানে না। ঝড়-জল-হাওয়া মানে না। চাঁদনি রাতে জোছনা আসে ঘরে। শীতের রাতে হিম হিম হাওয়া। অন্ধকার রাতে অন্ধকার আরও ঘন হয়। রাতে কখনও আলো জ্বলে না এ ঘরে। দরকার হয় না। নিত্য অভাব এবং নৈমিত্তিক কলহ তাদের সংসারের ভূষণ। তবে একবার বিছানায় গা এলিয়ে দিতে পারলেই হলো, ঘুমে কাদা। নিদ্রাদেবীর খুব পছন্দ তাদের। নিশ্চিন্তে ঘুমনোর সুখ তাদের আছে। 'হারাবার কিছু ভয় নেই সর্বহারার'।

রোজ সকালে দু'জন দু'টো ভাঙা থালা হাতে করে ফুলতলা বাসস্ট্যান্ডে আসে। বসে বসে ভিক্ষা করে। গাল-গল্প করে। গরিব উল্লাহ কীভাবে গরিব হলো, ফকির উল্লাহ কীভাবে ফকির হলো– সে সব গল্পও করে। গরিব উল্লাহর দাদার জমিদারি ছিল। জাল দলিল করে গোমস্তা সব হাতিয়ে নিয়েছে। তাদের পথে বসিয়েছে। মামলা-মোকদ্দমা করেও কোনো লাভ হয় নি। সেই থেকে ভিক্ষাই তাদের পেশা। ফকির উল্লাহর বাবার ছিল বিশাল ব্যবসা। আগুন লেগে পুড়ে ছাই। তিন তলা বাড়ি ছিল পদ্মার পাড়ে। নদীর ভাঙনে সব শেষ। সেই থেকে ভিক্ষাই একমাত্র গতি। এ ধরনের মুখরোচক গল্প বলা নিত্যদিনের বিষয়। পরনিন্দা-পরচর্চা থেকে রাজনীতি পর্যন্ত। কোন্ নেতা কেমন, কোন্ মন্ত্রী কী ভুল করেছে, কেন দেশের এ দুরবস্থা– এ সব নিয়ে বিজ্ঞজনের মতো মন্তব্য করা শুনে তাদের সবজান্তা মনে হয়। লেখাপড়া জানে না। তবু পত্রিকার ছেঁড়া পাতা উড়ে এলে চোখের সামনে মেলে ধরে, যেন পড়ছে। বোঝাতে চায় যে লেখাপড়াও জানে। কপালদোষে আজ ভিক্ষা করতে হচ্ছে।

সারাদিন ভিক্ষা করে। আবার সন্ধ্যায় ফিরে যায় ডেরায়। ক্ষিধে পেলে দু'টাকা দিয়ে একটা বন রুটি কিনে খায়, আর রাস্তার পাশের সরকারি টিউবওয়েল থেকে পেট ভরে পানি। দুপুরবেলা গোসল করতে নামে নদীতে। কিনারে থালার মধ্যে পয়সার পুটুলি রেখে তার উপর লুঙ্গি রেখে গামছা পরে নদীতে নামে। দুই তিনটা ডুব দিয়ে উঠে পড়ে। ছেলে বুড়া মেয়েরা কত লোকে গোসল করে নদীতে। কার মনে কী আছে কে জানে? কেউ যদি পয়সার পুটুলি নিয়ে দৌড় মারে? ভিজা গায়ে তীরে ওঠে মেয়েরা। হাবলুর মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। মেয়েদের গালিও খায় মাঝেমধ্যে। গালি খেয়ে হাসে। গালির মধ্যে যেন সূক্ষ্ম তৃপ্তি আছে। ভিক্ষে করে যা পায় তা দিয়ে চাল, তরকারি, নুন, মরিচ কিনে বাসায় ফেরে। যে দিন একটু বেশি রোজগার হয় সে দিন আড়াইশো গরুর গোশ্ত। একটু পেঁয়াজ-রসুন-আদা। মাছ কদাচিৎ হয়, শেষ

বাজারের পচাপ্রায় খলসে-পুঁটি। কখনও কখনও ফাউও জোটে দু'চারটে। রাতে কলাটা মুলোটাও পাওয়া যায় ফাউ। আধুলির একপিঠে যে শাপলা তাও জোটে। অন্যপিঠে যে আনারস, কলা, মুরগি ও ইলিশ– তা কখনও কেনার সামর্থ্য হয় না। কিন্তু দোকানে দরদাম করে। ইলিশ মাছের দাম, রুই-কাৎলা-বোয়ালের দাম। মুরগির দাম। দরদাম করার মধ্যেও একটা আত্মতৃপ্তি আছে।

সেদিন রাতে বাজার থেকে ফেরার পথে তারা দু'জন লক্ষ্য করল ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেদ করে আরও দু'টো অন্ধকার বেরুল পাশাপাশি দু'টো খুপ্‌রি থেকে। তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না তারা ক্ষেন্তি আর মেন্তি। দু'জনের দুই বড় মেয়ে। গাটে তাদের এখন টাকা আছে। না থেকে পারেই না। এরকম অন্ধকার থেকে বেরুলে কোঁচরে টাকা থাকে। কিছুটা তফাতে দুই বাপ দুই মেয়ের উপর চড়াও হয়। ফ্যাল্ টাকা। মেয়েরা অস্বীকার করে– টাকা নেই তাদের কাছে।– তাইলে কি ফাউ কাম করলি?

– মিথ্যা কস্ ক্যান?

– গোরুর গোশ্‌ত কিনুমনে।

– আদ্ধেক ভাগ দে।

টাকা বেরোয় না। ঘামের টাকা চামেই থাকে। কোনো কোনো দিন এমনি অপয়া যায়। সেদিন নিজেদের ভিক্ষুক বলে মনে হয়। একরাশ দুঃখ কষ্ট হতাশা অভিমান নিয়ে ডেরায় ফেরে। আর অদৃষ্টকে অভিশাপ দেয়।

দু'জন একে অপরের বাহুবদ্ধ। কাছ দিয়ে অন্য একজন যাবার সময় তার পায়ে একটা কী যেন ঠেকল। দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে হাত দিয়ে তুলে দেখল। চকচকে একটা আধুলি। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে পকেটে পুরে হাঁটা দিল। সে ভিক্ষুক কিনা বোঝা গেল না। তবে যে লোভী, তা নিশ্চিত। কোলাকুলিরত অবস্থায় ফকির উল্লাহ এবং গরিব উল্লাহ দু'জনেই দেখল এ দৃশ্য। কিছুক্ষণ নির্বাক সে দিকে তাকিয়ে থেকে দু'জন দু'জনার দিকে তাকাল। চোখে-মুখে হতাশা ফুটে উঠল। দু'জনের আলিঙ্গন শিথিল হলো। যেন বজ্র আঁটুনি, ফসকে গেঁড়ো। দু'জনের কলহের সুযোগে পয়সাটা চলে গেল তৃতীয় শক্তির কাছে। হীনবল হতবল দু'জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যার যার থালার সামনে বসে পড়ল আবার। আবার পথচারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা। কাতরোক্তি করা। দোয়া করা।

নিজেদের কলহের কারণে তৃতীয় ভিক্ষুক নিয়ে গেল আধুলি। সাথে আধুলির গায়ে আঁকা শাপলাফুল, আনারস, কলা, মুরগি ও ইলিশ। ধূসর গোধূলির মৃদু আলো এসে পড়ে আধুলি হারানো দুই ভিক্ষুকের মুখে। একটা উটকো ট্রাক হুড়মুড় করে প্রায় তাদের চাপা দিতে দিতে একগাদা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল নাকের উপর দিয়ে। গোধূলির ম্লান আলোটুকুও কেড়ে নিল। এবার ঘরে ফেরার পালা। কিন্তু আজ যেন আর উঠে দাঁড়ানোর শক্তিই নেই তাদের। তবু একে অপরের অবলম্বন হয়ে দু'জন দু'জনকে ধরে উঠে দাঁড়ায়। একে অপরের কাঁধে হাত রেখে ক্লান্ত দেহে ডেরার দিকে পা বাড়ায়, যেখানে জমে আছে গাঢ় এক চির অন্ধকার।